সমালোচনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা।

৭৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

পিপেল্‌স্‌ প্রেসে

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ১্ এক টাকা।

উৎসর্গপত্র।

পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর

কর-কমলে

স্নেহের সামান্য প্রতিদান স্বরূপ

এই গ্রন্থ

সাদরে সমর্পিত হইল।

সূচী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১।	অনাবশ্যক	১
২।	তার্কিক	৯
৩।	বিজ্ঞতা	২০
৪।	মেঘনাদ বধ কাব্য	২৮
৫।	নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি	৪১
৬।	সঙ্গীত ও কবিতা	৫০
৭।	বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা	৬০
৮।	ডি প্রোফণ্ডিস	৬৭
৯।	কাব্যের অবস্থা-পরিবর্ত্তন	৮১
১০।	চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি	৯০
১১।	বসন্তরায়	১০৭
১২।	বাউলের গান	১২২
১৩।	সমস্যা	১৩৩
১৪।	এক চোখো সংস্কার	১৪৬
১৫।	একটি পুরাতন কথা	১৫৫

সমালোচনা

অনাবশ্যক।

আমরা বর্ত্তমানের জীব। কোন জিনিষ বর্ত্তমানের পরপারে প্রত্যক্ষের বাহিরে গেলেই আমাদের হাতছাড়া হইবার যো হয়। যাহা পাইতেছি তাহা প্রত্যহই হারাইতেছি। আজ যে ফুলের আঘ্রাণ লইয়াছি, কাল সকালে তাহা আর রহিল না, কাল বিকালে তাহার স্মৃতিও চলিয়া গেল। এমন কত ফুলের ঘ্রাণ লইয়াছি, কত পাখীর গান শুনিয়াছি, কত মুখ দেখিয়াছি, কত কথা কহিয়াছি, কত সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছি, তাহারা নাই, এবং তাহারা এক-কালে ছিল বলিয়া মনেও নাই। যদিবা মনে থাকে সে কি আর প্রত্যক্ষের মত আছে? তাহা একটি নিরাকার অথবা কেবল মাত্র ছায়ার মত জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে, এইরূপ একটা জ্ঞান আছে মাত্র, অমুককে জানিতাম এইরূপ একটা সত্য অবগত আছি বটে। কেবল মাত্র জ্ঞানে যাহাকে জানি তাহাকে কি আর জানা বলে, তাহাকে মানিয়া লওয়া বলে। অনেক সময়ে

আমাদের কানে শব্দ আসে, কিন্তু তাহাকে শোনা বলি না; কারণ সে শব্দটা আমাদের কান আছে বলিয়াই শুনিতেছি, আমাদের মন আছে বলিয়া শুনিতেছি না। কান বেচারার না শুনিয়া থাকিবার যো নাই, কিন্তু মনটা তখন ছুটি লইয়া গিয়াছিল। তেমনি আমরা যাহা জ্ঞানে জানি তাহা না জানিয়া থাকিবার যো নাই বলিয়াই জানি; সাক্ষী আনিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেই জ্ঞানকে জানিতেই হইবে—সে যত বড় লোকটাই হউক না কেন, এ আইনের কাছে তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু উহার ঊর্দ্ধে আর জোর খাটে না। তেমনি আমরা অনেক অপ্রত্যক্ষ অতীত ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া জানি, কিন্তু আর তাহা অনুভব করিতে পারি না। মাঝে মাঝে অনুভব করিতে চেষ্টা করি, ভান করি, কিন্তু বৃথা!

কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয় না কি, যখন অতীত ঘটনার নামে বহুবিধ ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াও কিছুতেই মনের সম্মুখে তাহাকে আনিতে পারা গেল না, এমন কি যখন তাহার অস্তিত্বের বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হইল, তখন হয়ত সেদিনকার একটি চিঠির একটুখানি ছেঁড়া টুক্‌রা অথবা দেয়ালের উপর বহুদিনকার পুরাণ একটি পেন্সিলের দাগ দেখিবামাত্র সে যেন তৎক্ষণাৎ সশরীরে বিদ্যুতের মত আমার সমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়! ঐ কাগজের টুক্‌রাটি, পেন্সিলের দাগটি তাহাকে যেন যাদু করিয়া রাখিয়াছিল; তোমার চারি দিকে আরও ত কত শত জিনিষ আছে, কিন্তু সেই অতীত ঘটনার পক্ষে ঐ ছেঁড়া কাগজ টুকু ও সেই পেন্সিলের দাগটুকু ছাড়া আর সকল গুলিই Non-conductor। অর্থাৎ আমরা এমনি ভয়ানক

প্রত্যক্ষবাদী, যে, বর্ত্তমানের গায়ের উপর অতীতের একটা স্পষ্ট চিহ্ন থাকা চাই, তবেই তাহার সহিত আমাদের ভালরূপ আদান প্রদান চলিতে পারে। যাহার অতীত-জীবন বহুবিধ কার্য্যভার বহন করিয়া ধনবান বণিকের মত সময়ের পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই পথ চলিতে চলিতে একটা-না-একটা টুক্‌রা ফেলিতে ফেলিতে গিয়াছিল, সেই গুলি ধরিয়া ধরিয়া অনায়াসেই সে তাহার অতীতের পথ খুঁজিয়া লইতে পারে। আর আমাদের মত যাহার অলস অতীত রিক্তহস্তে পথ চলিতেছিল, সে আর কি চিহ্ন রাখিয়া যাইবে! সুতরাং তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই, সে একেবার হারাইয়া গেল!

ইতিহাস সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যায়। বর্ত্তমানের গায়ে অতীত-কালের একটা নাম সই থাকা নিতান্তই আবশ্যক। কালিদাস যে এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু আজ যদি আমি দৈবাৎ তাঁহার স্বহস্তে-লিখিত মেঘদূত পুঁথিখানি পাই, তবে তাঁহার অস্তিত্ব আমার পক্ষে কি রূপ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে! আমরা কল্পনায় যেন তাঁহার স্পর্শ পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারি। ইহা হইতে তীর্থযাত্রার একটি প্রধান ফল অনুমান করা যায়। আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই! যখন দেখি, ফুটন্ত, ছুটন্ত বর্ত্তমান স্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি প্রাচীন

জীর্ণ অংশেষ নিশ্চল ভাবে বসিয়া তাহার অমরতার অভিশাপের জন্য শোক করিতেছে অতীতের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে যে মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে!

কিছুইত থাকে না, সবইত চলিয়া যায়, তথাপি এই যে দুটি-একটি চিহ্ন অতীত রাখিয়া গিয়াছে, ইহাও মুছিয়া ফেলিতে চায়, এমন কে আছে? সময়ের অরণ্য অসীম। এই অন্ধকার অসীম মহারণ্যের মধ্য দিয়া আমরা একটি মাত্র পায়ের চিহ্ন রাখিয়া আসিতেছি, সে চিহ্ন মুছিয়া মুছিয়া আসিবার আবশ্যকটা কি? পথের মধ্যে যে গাছের তলায় বসিয়া খেলা করিয়াছ, যে অতিথিশালায় বসিয়া আমোদ প্রমোদে বন্ধুবান্ধবদের সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছ, একবারও কি ফিরিয়া যাইয়া সেই তরুর তলে বসিতে ইচ্ছা যাইবে না, সেই অতিথিশালার দ্বারে দাঁড়াইতে সাধ যাইবে না? কিন্তু ফিরিবে কেমন করিয়া যদি সে পথের চিহ্ন মুছিয়া ফেল! যে স্থান, যে গৃহ, যে ছায়া, যে আশ্রয় এককালে নিতান্তই তোমার ছিল তাহার অধিকার যদি একেবারে চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেল!

দেশ ও কালেই আমরা বাস করি! অথচ দেশের উপরেই আমাদের যত অনুরাগ। এক কাঠা জমির জন্য আমরা লাঠালাঠি করি, কিন্তু সুদূর-বিস্তৃত সময়ের স্বত্ব অনায়াসেই ছাড়িয়া দিই, একবারও তাহার জন্য দুঃখ করি না!

পুরাতন দিনের একখানি চিঠি, একটি আংটি, একটি গানের

স্থর একটা যা-হয়-কিছু অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দেয় নাই, এমন কেহ আছে কি? যাহার জ্যোৎস্নার মধ্যে পুরাতন দিনের জ্যোৎস্না, যাহার বর্ষার মধ্যে পুরাতন দিনের মেঘ লুকায়িত নাই, এতবড় অপৌত্তলিক কেহ আছে কি? পৌত্তলিকতার কথা বলিলাম, কেন না প্রত্যক্ষ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। জগৎকে দেখিয়া জগতাতীতকে মনে আনা পৌত্তলিকতা। একটি চিঠি দেখিয়া যদি আমার অতীতকালের কথা মনে পড়ে তবে তাহা পৌত্তলিকতা নহেত কি? ঐ চিঠিটুকু আমার অতীত কালের প্রতিমা। উহার কোন মূল্য নাই, কেবল উহার মধ্যে আমার অতীত কাল প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই উহার এত সমাদর। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এমন কোন লোক কি আছে যে তাহার পুরাতন দিবসের একটা কোনও চিহ্নও রাখিয়া দেয় নাই? আছে বৈকি! তাহারা অত্যন্ত কাজের লোক, তাহারা অতিশয় জ্ঞানী লোক! তাহাদের কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। যতটুকুর দরকার আছে কেবল মাত্র ততটুকুকেই তাহারা খাতির করে। বোধ করি দশবৎসর পর্য্যন্ত তাহারা মা-কে মা বলে, তাহার পর তাঁর নাম ধরিয়া ডাকে। কারণ, সন্তান পালনের জন্য যত দিন মায়ের বিশেষ আবশ্যক তত দিনই তিনি মা, তাহার পর অন্য বৃদ্ধার সহিত তাঁহার তফাৎ কি?

আমি যে সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি, তাঁহারা যে সত্য সত্যই বয়স হইলে মাকে মা বলেন না তাহা নহে। অনাবশ্যক মাকেও ইহাঁরা মা বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু অতীত মাতার

প্রতি ইঁহাদের ব্যবহার স্বতন্ত্র। মায়ের কাছ হইতে ইহাঁরা যাহা কিছু পাইয়াছেন, অতীতের কাছ হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাইয়াছেন, তবে কেন অতীতের প্রতি ইঁহাদের এমনতর অকৃতজ্ঞ অবহেলা! অতীতের অনাবশ্যক যাহা কিছু, তাহা সমস্তই ইঁহারা কেন কুসংস্কার বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া ফেলিতে চান? তাঁহারা ইহা বুঝেন না, শুষ্ক জ্ঞানের চক্ষে সমস্ত আবশ্যক অনাবশ্যক ধরা পড়ে না। আমাদের আচার ব্যবহারে কতকগুলি চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সে গুলি ভালও নয়, মন্দও নয়, কেবল দোষের মধ্যে তাহারা অনাবশ্যক, তাহাদের দেখিয়া কঠোর জ্ঞানবান লোকের মুখে হাসি আসে, এই ছুতায় তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে। মনে করিলে, তুমি কতকগুলি অর্থহীন অনাবশ্যক হাস্যরসোদ্দীপক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে মাত্র—কিন্তু আসলে কি করিলে! সেই অর্থহীন প্রথার মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত সুমহৎ অতীত দেবকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, একটি জীবন্ত ইতিহাসকে বধ করিলে, তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের একটি স্মরণচিহ্ন ধ্বংশ করিয়া ফেলিলে। তোমার কাছে তোমার মায়ের যদি একটি স্মরণ-চিহ্ন থাকে, বাজারে তাহার দাম নাই বলিয়া তোমার কাছেও যদি তাহার দাম না থাকে তবে তুমি মহাপাতকী। তেমনি অনেকগুলি অর্থহীন প্রথা পূর্ব্বপুরুষদিগের ইতিহাস বলিয়াই মূল্যবান। তুমি যদি তাহার মূল্য না দেখিতে পাও, তাহা অকাতরে ফেলিয়া দাও, তবে তোমার শরীরে দয়া-ধর্ম্ম কোন্‌খানে থাকে তাহাই আমি ভাবি! যাহাদের বুট-তরি আশ্রয় করিয়া তোমরা ভবসমুদ্র

পার হইতে চাও, সেই ইংরাজ মহাপুরুষেরা কি করেন একবার দেখ না। তাঁহাদের রাজসভায়, তাঁহাদের পার্ল্যামেণ্ট সমিতিতে, এবং অন্যান্য নানা স্থলে কতশত প্রকার অর্থহীন অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহা কে না জানে!

অতীত কাল ধরণীর মত আমাদের অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখে। যখন বাহিরে রৌদ্রের খরতর তাপ, আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়ে না, তখন শিকড়ের প্রভাবে আমরা অতীতের অন্ধকার নিম্নতন দেশ হইতে রস আকর্ষণ করিতে পারি। যখন সকল সুখ ফুরাইয়া গেছে তখন আমরা পিছন ফিরিয়া অতীতের ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্ন সকল অনুসরণ করিয়া অতীতে যাইবার পথ অনুসন্ধান করিয়া লই। বর্ত্তমানে যখন নিতান্ত দুর্ভিক্ষ নিতান্ত উৎপীড়ন দেখি তখন অতীতের মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে যাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে এত পুরাতত্ত্বের আলোচনা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ আমাদের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল অতীতকালকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। সে পথও যদি কেহ বন্ধ করিতে চায়, অতীতের যাহা কিছু অবশেষ আমাদের ঘরে ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাকে দূর করিয়া যদি কেহ অতীতকে আরও অতীতে ফেলিতে চায়, তবে সে সমস্ত জাতির অভিশাপের পাত্র হইবে।

যদি আমরা অতীতকে হারাই তবে আমরা কতখানি হারাই! আমাদের কতটুকু প্রাণ থাকে! একটি নিমেষ মাত্র লইয়া কিসের সুখ! আমাদের জীবন যদি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জলবিম্ব মাত্র হয়, তবে তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল জীবন। কিন্তু আমাদের জীবনের

জন্মশিখর হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত যদি যোগ থাকে তবে তাহার কত বল! তবে তাহা পাষাণের বাধা মানিবে না, কথায় কথায় রৌদ্রতাপে শুকাইয়া বাষ্প হইয়া যাইবে না। আমি কিছু পরগাছা নহি, গাছ হইতে গাছে ঝুলিয়া বেড়াই না। বাহিরের রৌদ্র, বাহিরের বাতাস, বাহিরের বৃষ্টি আমি ভোগ করিতেছি, কিন্তু মাটির ভিতরে ভিতরে প্রসারিত আমার অতীতের উপর আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন বর্ত্তমানে পাপে তাপে শোকে কাতর হইয়া পড়ি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন করি, সরল বাল্যকালের সমীরণ ভোগ করি, নবজীবনের প্রথম সঙ্কল্প, মহৎ উদ্দেশ্য, তরুণ আশা সকল পুনরায় দেখিতে পাই। আমার এ অতীতের পথ যদি মুছিয়া যাইত, তাহা হইলে আজ আমি কি হইতাম! একটি জরাজীর্ণ কঠোরহৃদয়, অবিশ্বাসী বিদ্রূপপরায়ণ বৃদ্ধ হইয়া উদাসনেত্রে সংসারের দিকে চাহিয়া থাকিতাম।

এই জন্যই আমি এই সকল অতিশয় তুচ্ছ দ্রব্যগুলিকে, অতীতকালের অতি সামান্য চিহ্নটুকুকেও যত্ন করিয়া রাখিয়াছি; অত্যধিক জ্ঞান লাভ করিয়া, কুসংস্কারের অত্যন্ত অভাবে সে গুলিকে অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিই নাই।

তার্কিক।

কেহ কেহ বলেন, যাঁহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, প্রতি কথায় যুক্তির লাঠালাঠি চলে, তর্কবিতর্ক না করিয়া যাঁহারা এক পা অগ্রসর হইতে দেন না, তাঁহাদের সহবাসে উপকার আছে। তাঁহাদের উৎপাতে কাঁচা কথা বলিবার যো থাকে না, দুর্ব্বল মত ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে, খুব খাঁটি মত না হইলে টিঁকিতে পারে না। বুদ্ধিরাজ্যে Survival of the Fittest নিয়ম খুব ভালরূপে বজায় থাকে। এ কথাটা আমার ত ঠিক মনে হয় না।

আমাদের কোন ভাব অহিরাবণের মত একেবারে জন্মিয়াই কিছু যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারে না। কিছু দিন ধরিয়া প্রশংসা, বন্ধুদিগের মমতা, ও অনুকূল যুক্তির লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য তাহাকে রীতিমত সেবন করান' আবশ্যক। যখন সে পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিবে, তখন বরঞ্চ, মাঝে মাঝে হুঁচট খাওয়া, মাথা ঠোকা, পড়িয়া যাওয়া মন্দ নহে। কিন্তু যেমনি আমার ভাবটি জন্মগ্রহণ করিল, অমনি যদি আমার নৈয়ায়িক কুস্তিওয়ালা খ্যাক্ করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরেন তবে ত তাহার আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না।

বন্ধুবান্ধবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের নূতন নূতন মত জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। কোন বিষয়ে আমাদের যথার্থ মত কি, আমাদের যথার্থ বিশ্বাস কি, তাহা সহসা জিজ্ঞাসা

করিলে আমরা বলিতে পারি না, আমরা নিজেই হয়ত জানি না, বন্ধুদিগের সহিত কথোপকথনের আন্দোলনে তাহারা ভাসিয়া উঠে। তখন আমরা তাহাদিগকে প্রথম দেখিতে পাই। সুতরাং তখনো আমরা আমাদের সেই কচি ভাবগুলিকে যুক্তির বর্ম্ম দিয়া আচ্ছাদন করিবার অবসর পাই নাই, তখনো তাহাদিগকে সংসারের কঠোর মাটির উপরে হাঁটাইতে শিখাই নাই, নানাশাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া তাহাদের অনুকূল মতগুলিকে বডিগার্ডের মত তাহাদের চারদিকে খাড়া করিয়া দিই নাই। এমন সময়ে যদি নৈয়ায়িক শিকারীর ইঙ্গিতে দেশী বিলাতী, আধুনিক প্রাচীন, যত দেশের, যত ন্যায়শাস্ত্রের, যতগুলা যুক্তির ক্ষুধিত খেঁকি কুকুর আছে, সকলগুলা একবারে দাঁত খিঁচাইয়া সেই অসহায়দের উপর আসিয়া পড়ে, Facts নামক ছোট ছোট ইঁট পাট্‌কেল চারদিক হইতে তাহাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকে, তবে সে বেচারীরা দাঁড়ায় কোথায়?

তুমি নৈয়ায়িক, Facts নামক গোটাকতক সরকারী লাঠিয়াল তোমার হাতধরা আছে, তোমার যাহা কিছু আছে মান্ধাতার আমল হইতে তাহার যোগাড় হইয়া আসিতেছে, আর আমার এই ভাবশিশু এই মুহূর্ত্তে সবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহার প্রতি আক্রমণ করিয়া তোমার পৌরুষ কি? আর একটু রোস' এখনো ইহা কথোপকথনের কোলে কোলে ফিরিতেছে, যখন এ সাহিত্য-ক্ষেত্রে রণভূমিতে দাঁড়াইবে, তখন ইহাতে তোমাতে বোঝাপড়া চলিতে পারিবে।

এই সকল ন্যায়শাস্ত্রবিদেরা রসিকতার কৈফিয়ৎ চাহেন, বিদ্রূপ করিয়া একটা অসঙ্গত সঙ্গত কথা কহিলে তর্কের দ্বারায় তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করাইয়া দেন, কথায় কথায় যদি একটা ঐতিহাসিক Fact-এর উল্লেখ করি, সেটা আর সকল বিষয়ে যেমনই সঙ্গত হউক না কেন, তাহার তারিখের একটু ইতস্ততঃ হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাঁচ Volume ইতিহাসের চাপে সেটাকে ছারপোকার মত মারিয়া ফেলেন; মুখে মুখে যদি এক্‌টা কিছুর সহিত কিছুর তুলনা করি, অম্‌নি তিনি ফিতা হাতে করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রমে তাহার মাপ-জোক করিতে আরম্ভ করেন; আমি বলিলাম, অমুক লোকটা নিতান্ত গাধার মত, তিনি অম্‌নি বলিলেন, সে কেমন কথা, তাহার ত চারটে পা নাই, আর তাহার কান দুটা কিছু নিতান্তই বড় নয়, তাহার গলার আওয়াজ ভাল নহে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি গাধার সঙ্গে তাহার তুলনা হয়? আমি বলিলাম হে বুদ্ধিমান্, গাধার বুদ্ধির সহিত আমি তাহার বুদ্ধির তুলনা করিতেছিলাম, আর কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি অম্‌নি বলিলেন, তাহাও কি ঠিক মেলে? পশু বস্তুই দেখিতে পায়, কিন্তু বস্তুর বস্তুত্ব কি সে মনে করিতে পারে? সে শ্বেতবর্ণ পদার্থ মনে আনিতেও পারে, কিন্তু শ্বেতবর্ণ নামক পদার্থ-অতিরিক্ত একটা ভাবমাত্র সে কি মনে ধারণা করিতে পারে? ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কাতর হইয়া বলিলাম, দোহাই মাপ কর, আমার অপরাধ হইয়াছে, এবার হইতে গাধার সহিত তাহার বুদ্ধির তুলনা না দিয়া তোমার সহিত দিব! শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

এইরূপ যাঁহারা তার্কিক বন্ধুদিগের সহবাসে থাকেন, তাঁহাদের ভাবের উৎস-মুখে পাথর চাপান' থাকে। বন্ধুত্বের দক্ষিণা বাতাস বন্ধুদিগের অনুকূল হাস্যের সূর্য্যকিরণের অভাবে তাঁহাদের হৃদয়-কাননের ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিতে পারে না। যে সকল বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ের অতি প্রিয় সামগ্রী, পাছ সেগুলিকে লইয়া যুক্তির কাকচিলগুলা ছেঁড়াছিড়ি করিতে আরম্ভ করে এই ভয়ে তাহাদিগকে হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যেই লুকাইয়া রাখেন, তাহারা আর সূর্য্যকিরণ পায় না, তাহারা ক্রমশঃই রুগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কুসংস্কারের আকার ধারণ করে! কথায় কথায় যে সকল মত গঠিত হইয়া উঠিল, তাহারা চারিদিকে তর্কবিতর্কের ছোরাছুরি দেখিয়া ভয়ে আত্মহত্যা করিয়া মরে।

তার্কিক বন্ধুদিগের সহবাসে থাকিলে প্রাণের উদারতা সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। আমি কাল্পনিক লোক, আমার জগৎ লাখেরাজ জমি, আমি কাহাকেও এক পয়সা খাজনা দিই না, অথচ জগতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারি, যাহা ইচ্ছা উপভোগ করিতে পারি। তুমি যুক্তি মহারাজের প্রজা, যুক্তিকে যতটুকু জমির খাজনা দিবে, ততটুকু জমি তোমার, যখনি খাজনা দিতে না পারিবে, তখনি তোমার জমি নিলামে বিক্রয় হইয়া যাইবে। তোমার তার্কিক বন্ধু পাশে বসিয়া ক্রমাগত তোমার জমি সার্ব্বে করিতেছেন, ও তাহার সীমাবন্দী করিয়া দিতেছেন; প্রতিদিন এক বিঘা, দুই বিঘা করিয়া তোমার অধিকার কমিয়া আসিতেছে।

আমি যখন রাত্রিকালে অসংখ্য তারার দিকে চাহিয়া আমার

অনন্ত জীবন কল্পনা করিতেছি, জগতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত আমার প্রাণের বিচরণভূমি হইয়া গিয়াছে, আমি যখন নূতন নূতন আলোক, নূতন নূতন গ্রহ মাড়াইয়া নূতন নূতন জীবকে স্বজাতি করিয়া, বিস্ময়-বিহ্বল পথিকের মত অনন্ত বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে অনন্ত পথে যাত্রা করিয়াছি, বিচিত্র জগৎপূর্ণ অনন্ত আকাশের মধ্যে যখন আমার জীবনের আদি অন্ত হারাইয়া গিয়াছে, যখন আমি মনে করিতেছি এই কাঠা-তিনেক জমির চারদিকে পাঁচিল তুলিয়া এই খানেই ধূলির মধ্যে ধূলিমুষ্টি হইয়া থাকা আমার চরম গতি নহে, জলবায়ু আকাশ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র বিশ্ব-চরাচর আমার অনন্ত জীবনের ক্রীড়া ভূমি,—তখন দূর কর তোমার যুক্তি, তোমার তর্ক— তোমার ন্যায়শাস্ত্র গলায় বাঁধিয়া যুক্তির শানবাঁধান কুয়োর মধ্যে পরমানন্দে তুমি ডুবিয়া মর'। তখন তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে আমার ইচ্ছাও থাকে না অবসরও থাকে না। তুমি যে আমার অতখানি কাড়িতে চাও তাহার বদলে আমাকে কি দিতে পার? তোমার আছে কি? আমি যে জায়গায় বেড়াইতে ছিলাম, তুমি তাহার কিছু ঠিকানা করিয়াছ? সেখানকার মেরুপ্রদেশের মহা সমুদ্রে তোমার এই বুদ্ধির ফুটো নারিকেল মালায় চড়িয়া কখনো কি আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছিলে? পৃথিবীর মাটির উপর তুমি রেল পাতিয়াছ, এই ৮০০০ মাইলের ভূগোল তুমি ভালরূপ শিখিয়াছ, অতএব যদি আমি ম্যাডাগাস্কারের জায়গায় কামস্কাট্‌কা কল্পনা করি, তাহা হইলে না হয় আমাকে তোমাদের স্কুলের এক ক্লাস নামাইয়া দিও, কিন্তু যে অনন্তের মধ্যে তোমাদের ঐ

রেলগাড়িটা চলে নাই, কোন কালে চলিবে বলিয়া ভরসা নাই সেখানে আমি একটু হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছি ইহাতে তোমাদের মহাভারত কি অশুদ্ধ হইল?

তোমরা ত আবশ্যকবাদী, আবশ্যকের এক ইঞ্চি এদিকে ওদিকে যাওনা। তোমাদেরই আবশ্যকের দোহাই দিয়া তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে অনন্তরাজ্যে বিচরণ করিতেছি, যুক্তির কারাগারে পূরিয়া আমাকে সে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার আবশ্যকটা কি? যাহাতে মানুষের সুখ, উন্নতি, উপকার হয়, তাহাইত সকল জ্ঞানের সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য? আমি যে অসীম সুখে মগ্ন হইতেছিলাম, আমার যে প্রাণের অধিকার বাড়িতেছিল, আমার যে প্রেম জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, ইহা সংক্ষেপ করিয়া দিয়া তোমাদের কি প্রয়োজন সাধন করিলে? মনুষ্যের কি উপকার করিলে, কি সুখ বাড়াইলে? মানুষের সুখের আশা, কল্পনার অধিকার এতটাই যদি হ্রাস হয়, তবে তোমার এই মহামূল্য যুক্তিটা কিছুক্ষণের জন্য শিকায় তোলা থাক্‌না কেন?

যুক্তির মানে কি? যোজনা করা ত? একটার সঙ্গে আর একটার যোগ করা। পতনের সঙ্গে হাত পা ভাঙ্গার যোগ আছে, সুতরাং পতনের পর হাত পা ভাঙ্গা যুক্তিসিদ্ধ। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে যে হাত পা ভাঙ্গিবে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ, এই কার্য্যকারণের মধ্যে একটা যোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যায়, আমরা কেবল কতকগুলি ঘটনাই দেখিতে বা জানিতে পাই, কোন্ কার্য্যকারণের যোগ আমাদের চোখে পড়ে! ঈথর নামক সূক্ষ্ম

পদার্থে ঢেউ উঠিলে আমরা যে আলো দেখিতে পাই, ইহার যুক্তি কি? এ দুইটি ঘটনার মধ্যে যোগ কোথায়? আমাদের মস্তিষ্কের কতকগুলি পরমাণু ঘোরার সঙ্গে, আমাদের স্মৃতির, ভাবনার, মনোবৃত্তির কি যোগ থাকিতে পারে? এমন কি কার্য্যকারণশৃঙ্খলা আছে, যাহার পদে পদে missing links নাই? এইত তোমার যুক্তি! এই তৃণটি ধরিয়া তুমি অনন্ত নামক অকূল অতলস্পর্শ সমুদ্রে কি বলিয়া ভাসিতে চাও। যুক্তির গোটাকতক কাজ আছে তার আর ভুল নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ দাম্ভিকটা যে যেখানে সেখানে মোড়লী করিয়া বেড়াইবে সে কাহার প্রাণে সয়? তার নিজের কাজই ঢের বাকি পড়িয়া আছে, পরের কাজে ব্যাঘাত করিয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক?

জগতের যেমন একদিকে সীমা, আর-একদিকে অনন্ত, একদিকে তীর আর-একদিকে সমুদ্র, আমাদের মনেরও তেমনি একদিকে সীমা আর-একদিকে অসীম; সীমার রাজ্যে যুক্তির শাসন, অতএব সে রাজ্যে যুক্তির শাসন লঙ্ঘন করিলে পদে পদে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যখনি অসীমের রাজ্যে পদার্পণ করিলাম, তখনি আমরা আর যুক্তির প্রজা নহি, অতএব হে বন্ধু হে তার্কিক, আমি যখন অসীমের রাজ্যে আছি তখন আমাকে যুক্তির আইনের ভয় দেখাইলে আমি মানিব কেন?

তাই বলিতেছি, তুমি যে কথায় কথায় আমার সঙ্গে তর্ক করিতে আইস, সেটা আমার ভাল লাগে না, এবং তাহাতে কোন কাজও হয় না। তুমি আমি একত্র থাকাটাই অযৌক্তিক, কারণ, তোমাতে

আমাতে কোন যোগই নাই! তোমাকে আমি হীন বলিতেছি না, তুমি হয়ত মস্ত লোক, তুমি হয়ত রাজা, কিন্তু শার্ঙ্গরব দুষ্যন্তকে যেরূপ চক্ষে দেখিয়াছিলেন আমিও হয়ত তোমাকে সেইরূপ চক্ষে দেখিবঃ—

"অভ্যক্তমিব স্নাতঃ, শুচিরশুচিমিব, প্রবুদ্ধইব সুপ্তম্" ইত্যাদি যুক্তির সৈন্য লইয়া তুমি তোমার নিজ রাজ্যে একজন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ লোক, উহারই সাহায্যে তুমি কত রাজ্য অধিকার করিলে, কত রাজ্য ধ্বংশ করিলে, কিন্তু আমার বিস্তৃত রাজ্যের একতিলও তুমি কাড়িয়া লইতে পার না। তুমি আমাকে হাজার চোখ রাঙাও না কেন আমি ডরাই না। আমার অধিকারে আসিবার ক্ষমতা তুমি হারাইয়াছ, কিন্তু তোমার অধিকারে আমি অনায়াসেই যাইতে পারি। তোমাতে আমাতে বিস্তর প্রভেদ।

আমার তার্কিক বন্ধু এই বলিয়া আমার নিন্দা করেন যে, আমি এক সময়ে যাহা বলিয়াছি আর-এক সময়ে তাহার বিপরীত কথা বলি; সে কথাটা ঠিক। কিন্তু তাহার একটা কারণ আছে। আমি যাহা বলি, তাহা প্রাণের ভিতর হইতে বলি, যুক্তি অযুক্তি খতাইয়া হিসাব পত্র করিয়া বলি না। আমি যাহার কথা বলি, মমতার প্রভাবে তাহার সহিত একবারে মিশাইয়া যাই, সুতরাং কেবল মাত্র তাহার কথাই বলি তাহার উল্টাদিকের কথাটা বলি না। প্রকৃতিতেও তাহাই হয়। প্রকৃতির দিন প্রকৃতির রাত্রের বিপরীত কথা বলিয়া থাকে, প্রকৃতির পূর্ব্বদিক, প্রকৃতির পশ্চিমদিকের কথা বলে না। প্রকৃতির পদে পদে বিরোধী উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহারা কি বাস্তবিকই বিরোধী? তাহারা দুই বিপরীত সত্য। আমি আলো

হইয়া আলোর কথা বলি, অন্ধকার হইয়া অন্ধকারের কথা বলি। আমার দুটা কথাই সত্য। আমি কিছু এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসি নাই যে একেবারে বিরোধী কথা বলিব না; যে ব্যক্তি কোন কালে বিরোধী কথা বলে নাই তাহার বুদ্ধি ত জড়পদার্থ; তাহার কোন কথার কোন মূল্য আছে কি? আমরা যে বিরোধের মধ্যেই বাস করি। আমাদের অদ্য আমাদের কল্যকার বিরোধী, আমাদের বৃদ্ধকাল আমাদের বাল্যকালের বিরোধী; সকালে যাহা সত্য বিকালে তাহা সত্য নহে। এত বিরোধের মধ্যে থাকিয়াও যাহার কথার পরিবর্ত্তন হয় না, যাহার মত অবিরোধে থাকে, তাহার বুদ্ধিটাত একটা কলের পুতুল, যত বার দম দিবে ততবার একই নাচন নাচিবে!

উপসংহারে আর গুটিদুই কথা বলিয়া শেষ করি।

যে পাড়ার ক্রোশতিনেকের মধ্যে তার্কিক লোকের গন্ধ আছে, সেখানে বোধ করি, কোন ভাবুক লোক তিষ্ঠিতে পারেন না। বোধ করি, তার্কিক লোকের মুখ দেখিলেই ভাবের বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। অতএব যাঁহারা ভাবের চর্চ্চা করিতে চান্ তাঁহারা কাছাকাছি এমন বন্ধু রাখিবেন, যাঁহাদের সহিত মতের মিল আছে। অনুরাগের আবহাওয়ার মধ্যে থাকিলে মনের গূঢ় ক্ষমতাগুলি যেমন সতেজে মাটি ফুঁড়িয়া উঠে, এমন আর কোথাও নয়।

একটা গাছে কতশত বীজ জন্মে। তাহার মধ্যে সবগুলা কিছু গাছ হয় না। কিন্তু গুটিকত গাছ জন্মাইবার উদ্দেশে বিস্তর নিস্ফল বীজ জন্মান আবশ্যক। আমাদেরো সকল ভাব কিছু সফল হইবে

না। কিন্তু ভাবের প্রচুরতা আবশ্যক। গোটাকতক থাকিবে, অনেকগুলি মরিবে। কিন্তু প্রতিকূলতার প্রখর প্রভাবে যদি ভাবের বিকাশ একবারেই বন্ধ হয় তবে আর কি হইল?

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি সাহিত্যে প্রতিকূল সমালোচনা কি ভাল? ভাল বইয়ের ভাল সমালোচনা ভাল, কুরুচি-বিকাশক হানিজনক বইয়ের নিন্দা করাও দোষের নহে, কিন্তু লেখকের ক্ষমতার অভাবে বা বুদ্ধির দোষে অসম্পূর্ণ গ্রন্থগুলিকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করিলে তাহাতে কি ভাল হয় বুঝিতে পারি না।

সত্যের অংশ।

সত্যকে আংশিক ভাবে দেখিলে অনেক সময়ে তাহা মিথ্যার রূপান্তর ধারণ করে। একপাশ হইতে একটা জিনিষকে দেখিয়া যাহা সহসা মনে হয়, তাহা একপেশে সত্য, তাহা বাস্তবিক সত্য না হইতেও পারে। আবার অপর পক্ষেও একটা বলিবার কথা আছে। কেহ সত্যকে সর্ব্বতোভাবে দেখিতে পায় না। সত্যকে যথাসম্ভব সর্ব্বতোভাবে দেখিতে গেলে প্রথমে তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিতে হইবে, তাহা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। ইহা আমাদের অসম্পূর্ণতার ফল। আমরা কিছু একেবারেই একটা চারি-কোণা দ্রব্যের সবটা দেখিতে পাই না—ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হয়। এই নিমিত্ত

উচিত এই যে, যে যে-দিকটা দেখিয়াছে সে সেই দিকটাই সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুক, অবশেষে সকলের কথা গাঁথিয়া একটা সম্পূর্ণ সত্য পাওয়া যাইবে। আমাদের এক-চোখো মন লইয়া সম্পূর্ণ সত্য জানিবার আর কোন উপায় নাই। আমরা একদল অন্ধ, আর সত্য একটি হস্তী। স্পর্শ করিয়া করিয়া সকলেই হস্তীর এক একটি অংশের অধিক জানিতে পারি না; এই জন্যই কিছু দিন ধরিয়া, হস্তীকে কেহ বা স্তম্ভ, কেহ বা সর্প, কেহ বা কুলা বলিয়া ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকি, অবশেষে সকলের কথা মিলাইয়া বিবাদ মিটাইয়া লই। আমি যে ভূমিকাচ্ছলে এতটা পুরাতন কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই—আমি জানাইতে চাই—একপেশে লেখার উপর আমার কিছুমাত্র বিরাগ নাই। এবং আমার মতে, যাহারা একেবারে সত্যের চারিদিক দেখাইতে চায়, তাহারা কোন দিকই ভাল করিয়া দেখাইতে পারে না—তাহারা কতকগুলি কথা বলিয়া যায়, কিন্তু একটা ছবি দেখাইতে পারে না। একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথা বেশ স্পষ্ট হইবে। একটা ছবি আঁকিতে হইলে, যথার্থতঃ যে দ্রব্য যেরূপ ঠিক সেরূপ আঁকা উচিত নহে। যখন চিত্রকর নিকটের গাছ বড় করিয়া আঁকে ও দূরের গাছ ছোট করিয়া আঁকে, তখন তাহাতে এমন বুঝায় না যে বাস্তবিকই দূরের গাছগুলি আয়তনে ছোট। একজন যদি কোন ছবিতে সব গাছ গুলি প্রায় সম-আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সত্য বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না—অর্থাৎ তাহাতে সত্য আমাদের মনে অঙ্কিত হয় না। লেখার বিষয়েও তাহাই বলা যায়। আমি যে

ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই, সেই ভাবটাই যদি বড় করিয়া না আঁকি, ও তাহার বিপরীত দিকের সীমান্ত যদি অনেকটা ক্ষুদ্র, অনেকটা ছায়াময়, অনেকটা অদৃশ্য করিয়া না দিই—তবে তাহাতে কোন উদ্দেশ্যই ভাল করিয়া সাধিত হয় না; না সমস্তটার ভাল ছবি পাওয়া যায়, না একাংশের ভাল ছবি পাওয়া যায়। এই জন্যই লেখক-চিত্রকরদিগকে পরামর্শ দেওয়া যায়, যে যে ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ, তাহাই বড় করিয়া আঁক; ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার করিয়া, সত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া—ন্যায়কে বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে খাট করিবার কোন আবশ্যক নাই।

বিজ্ঞতা।

সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের অনেক বাধা আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে বোধ করি একটি গুরুতর বাধা আছে! যখন বড় বড় বিজ্ঞগণ ঠোঁট টিপিয়া, চোখে চসমা আঁটিয়া শিশু অনুষ্ঠানটিকে ঘিরিয়া বসেন, সোজা সোজা কাজের মধ্য হইতে বাঁকা বাঁকা উদ্দেশ্য বাহির করিতে থাকেন, ও পরস্পর চোক-টেপাটিপি করিয়া বলিতে থাকেন "ওহে, বুঝেছ এ সমস্ত কেন?" তখন বোধ করি উৎসাহের রক্ত জল হইয়া যায়, উদ্যমের হাত পা শিথিল হইয়া পড়ে। এই সকল তীক্ষ্ণনাসিকা ক্ষুরোজ্জ্বলচক্ষু, ধারাল' পেঁচাল-বুদ্ধিগণ তিল হইতে তাল, সামান্য হইতে অসামান্য, সৎ হইতে অসৎ আবিষ্কার করিয়া সদনুষ্ঠানের

প্রাণে বাঁকা কটাক্ষপাত করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল তাহার বুক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেন। সর্প জাতি, বোধ করি, বড় বুদ্ধিমান হইবে, নহিলে তাহারা বাঁকিয়া চলে কেন? হে বিজ্ঞগণ, তোমরাও খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু একটা বিষয় তোমাদের জানা নাই, পৃথিবীতে সিধা জিনিষও অনেক আছে; তোমাদের প্রাণের বাঁকা আর্শিতে যে একটা বাঁকা ছায়া দেখিতেছ, জগতের চেহারা খানা নিতান্তই অমনতর না। হায় হায়! জন্মেজয় যখন সর্পসত্র করিয়াছিলেন তখন কি গোটাকতক ঢোঁড়া সাপই মরিয়াছিল, তোমাদের মত বিষাক্ত বুদ্ধিমান সাপগুলা ছিল কোথায়?

তুমি সৎকার্য্য করিতেছ বলিয়া বিজ্ঞ লোকেরাও যে তাহাকে সৎ মনে করিবে, এ কি করিয়া আশা করা যায়? তাহা হইলে বিধাতা তাহাদিগকে বিজ্ঞ করিয়াই গড়িলেন কেন? বসন্ত আসিয়াছে বলিয়া কি কাক মিঠা ডাকিবে? তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে কাক করিলেন কেন? সে যে বুদ্ধিমান পক্ষী! যখন কোকিল ডাকিতে থাকে, ফুল ফুটিয়া উঠে, বাতাস প্রাণ খুলিয়া দেয়, তখন সে শাখায় বসিয়া বুদ্ধিপূর্ণ ক্ষুদ্র চক্ষু মিটমিট করিতে থাকে, অবিশ্বাসের সহিত চারিদিকে চাহিয়া দেখে ও বেস্থরে ডাকিয়া উঠে কা। বসন্তের সহিত তাহার স্থর মেলে না বলিয়া সে কি চুপ করিয়া থাকিবে? সে যে বুদ্ধিমান জীব! সে বলে, বসন্তের স্থর বেস্থরা বলিতেছে! যখন কোকিল ডাকে, অমনি সে ঘাড় নাড়িয়া বলে, কা,—যখন ফুল ফুটে অমনি সে ঘাড় নাড়িয়া বলে কা—অর্থাৎ কিছুতেই সে সায় দিতে পারে না, সে বলে যে, আগাগোড়া স্থর মিলিতেছে না। শুনা গেছে,

মনুষ্যলোকে এমন অঙ্গহীন দেখা যায়, যাহার একটা কান নাই, এমন কি, দুইটা কানই খরচ হইয়া গেছে; হে কাক, স্বভাবতই—জন্মাবধিই তোমার কানের অভাব—অতএব কে তোমার কান ধরিয়া শিখাইবে যে, তোমার গলাটাই বেসুরা! কিন্তু তবুও ফুল ফোটে কেন, তবুও কোকিল ডাকে কেন? বসন্তের প্রাণের মধ্যে বসিয়া কে এমন একটা তানপুরা বাজাইতেছে, যাহাতে এত বেসুরের মধ্যেও সে অমন সুর ঠিক রাখিতেছে! কিন্তু সুর কি ঠিক থাকে? সাধ কি যায় না গান বন্ধ করি? ক'জনের প্রাণ এমন আছে, যাহারা বেতালা বেসুরা সঙ্গতের সহিত—অর্থাৎ অসঙ্গত সঙ্গতের সহিত গান গাহিয়া উঠিতে পারে? কোকিলও তাহা পারে না;—যখন বর্ষার সময় ভেকগুলা অসম্ভব ফুলিয়া উঠিয়া জগৎসংসারে ভাঙ্গা গলায় নিজের মত জারি করিতে থাকে—তখন কোকিল চুপ করিয়া যায়। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম—হে ভেকগণ, তোমাদেরই জয়! তোমরা আরো ফুলিতে থাক—আরো লম্ফ দাও—আরো মক্ মক্ কর! তোমরা কর্কশ কণ্ঠ লইয়া জগতের গান বন্ধ করিতে পারিয়াছ, অতএব তোমরাই জিতিলে!

হে বিধাতা, জগতে কাক সৃষ্টি করিয়াছ বলিয়া তোমার দোষ দিই না। কাকের অনেক কাজ আছে। কিন্তু তাহাকে যে কাজ দিয়াছ, সেই কাজেই সে লিপ্ত থাকে না কেন? সৌন্দর্য্যপূর্ণ বসন্তের প্রাণের মধ্যে সে কেন তাহার কঠোর কণ্ঠের চঞ্চু বিঁধিতে থাকে?

কেন? তাহার কারণ, বড় বড় বুদ্ধিমান লোকের সৌন্দর্য্যের উপর বড় একটা বিশ্বাস নাই, সৎ-উদ্দেশ্যের প্রতি অকাট্য সংশয়

বিদ্যমান। এই জন্য সৎ-কার্য্যের নাম শুনিলেই ইহাঁদের সংশয়-কুঞ্চিত অধরোষ্ঠের চারিদিকে পাণ্ডুবর্ণ মড়কের মত একটা বিষাক্ত হাসি ফুটিয়া ওঠে। অতি-বুদ্ধিমান জীবের সম্মুখের দাঁতের পাটিতে যে একটা দারুণ হাস্য-বিষ আছে—হে জগদীশ্বর, সেই বিষ হইতে পৃথিবীর সমুদয় সৎকার্য্যকে রক্ষা কর। ইহাঁরা যখন পরস্পর টেপা-টিপি করিয়া বলিতে থাকেন "এই লোকটার মতলব বুঝিয়াছ? কেবল আমাদের খোষামোদ করা" বা "অমুকের নিন্দা করা" বা "সাধা-রণের কাছে নাম পাইবার প্রয়াস"—তখন সৎলোকের জীবনের মূলে গিয়া কুঠারাঘাত পড়ে তাহার সমস্ত জীবনের আশা ম্রিয়মাণ হইয়া যায়।

সকল কাজ, সকল বিষয় হইতেই একটা গূঢ় মৎলব বাহির করি-বার চেষ্টা অনেক কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, কেহ কেহ এমন আত্মাভিমানী আছে যে, নিজেকেই সমস্ত কথা, সমস্ত কাজের লক্ষ্য মনে করে। সমস্ত জগৎ যেন তাহার দিকেই আঙুল বাড়াইয়া আছে। সে যে কথা শুনে, আত্মম্ভরিতার ব্যাকরণ ও অভিধানের সহিত মিলাইয়া তাহার একটা গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিতে থাকে। সে যে কাজ দেখে আত্মাভিমানের চাবি দিয়া সেই কাজের গূঢ় কবাট উদ্ঘাটন করিয়া তাহার মধ্যে নিজের প্রতিমা দেখিতে পায়। সে মনে করে বিশ্বচরাচর খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়া তাহার অনিষ্ট বা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই দিন রাত্রি একটা পরামর্শ করিতেছে! সে পথপার্শ্বস্থিত সাপের মত সর্ব্বদাই মনে করে, পান্থগণ তাহারই লেজ মাড়াইবার জন্য পাকচক্র করিতেছে, এই জন্য সে ভীত হইয়া আগে

হইতেই ছোবল মারে! এই সকল কীটগণ মনে করে ফুলেরা যে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে সে কেবল ইহাদের দংশন-সুখ অনুভব করিবার জন্যই! এই সকল পেচকেরা মনে করে যে, সূর্য্য যে কিরণ দান করেন, সে কেবল পেঁচার সহিত তাঁহার শত্রুতা আছে বলিয়াই।

আর এক দল লোক আছেন, তাঁহারা চিরকাল মৎলব খাটাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না পৃথিবীতে কাহারো উদারতা আছে। সিধা কথা, সামান্য কাজের মধ্য হইতে একটা ঘোরতর গূঢ় মৎলব বাহির করিতে ইঁহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত আমোদ পায়। একটা দুরন্ত অস্থির ছুঁচাল বক্রবুদ্ধি ইঁহাদের মনের মধ্যে দিন-রাত ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহাকেত একটা কাজ দিতে হইবে—সিধা কাজে সে খেলাইতে পায় না—এই নিমিত্ত সিধার মধ্যেও সে একটা বাঁকা রাস্তা গড়িয়া লয়। খেলাইবার জায়গা ভাল! একজন লোকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র আশা, যাহার কাছে সে তাহার দুর্দ্দান্ত স্বার্থপরতাকে বলিদান দিয়াছে, মান অপমানকে তৃণ জ্ঞান করিয়াছে তাহাই লইয়া খেলা! এক জন লোক যখন পরের দুঃখ দেখিয়া, দারিদ্র্য দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সেই অশ্রুবিন্দু লইয়া সমালোচনা! এক জন সহৃদয় লোক যখন উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রাণের কথা বলিতেছে, তখন তাহার সেই কথা গুলিকে বাঁকা ছাঁচে ঢালিয়া তাহাদের আকৃতি সম্পূর্ণ বদল করিয়া দেওয়া। এ সকল কেমনতর হৃদয়হীন খেলা। ইহাতে যে তোমার নিজের হৃদয়ের সর্ব্বনাশ করা হয়। ফুল মৎলব করিয়া সুন্দর হইয়াছে, পাখী মৎলব করিয়া

সুন্দর গাহিতেছে,—সর্ব্বদা পাহারা দিতে থাক, পাছে মৎলব ধরা না পড়ে—পাছে যাহার মৎলব আছে তাহাকে সরল মনে করিয়া তুমি ঠকিয়া যাও, তুমি নির্ব্বোধ বনিয়া যাও। আমার বুদ্ধিমান হইয়া কাজ নাই, আমি চিরকাল ঠকিব, আমি চিরকাল নির্ব্বোধ হইয়া থাকিব! আমি সুন্দরকে উপভোগ করিতে চাই, আমি সৌন্দর্য্যকে বিশ্বাস করিতে চাই। আমি ঠকিতে চাই, কারণ এ স্থলে ঠকিলেও লাভ। আর, সব চেয়ে লোকসান হয় তোমারই! তোমার ঐ বুদ্ধির টেরা চোক দুটার উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রকৃতিকে বাঁকা দেখিতেছ—সে কি তোমার বড় সুখের কারণ হইয়াছে? তাহার চেয়ে কি তোমার ঐ চোখ দুটা অন্ধ হইলেই ভাল ছিল না?

তোমাদের সুখ ত ভারি দেখিতেছি! তোমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পার না, প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পার না, প্রাণ খুলিয়া পরকে বিশ্বাস করিতে পার না। "যদি" "কিন্তু" "কদাচ" "কিঞ্চিৎ" প্রভৃতি কথাগুলা ব্যবহার করিয়া কৃপণের দড়ি-বাঁধা টাকার থলির মুখের মত তোমাদের ভাষাকে কুঞ্চিত সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছ। ইহাকেই তোমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ মনে কর। ভাল লোককে "হম্বগ্" মনে করা, ভদ্রতাকে হীনতা মনে করা, যে তোমাদের নিজের মতাবলম্বী নয় তাহাকে অশিক্ষিত অপদার্থ মনে করা, যশস্বী লোকের যশকে ফাঁকি মনে করা, তোমাদের অপেক্ষা শত গুণে বিদ্বান লোকের বিদ্যার গভীরতা নাই বলিয়া লোকের কাছে প্রচার করা, কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া মত ব্যক্ত করা, নিজেকে ভারি এক জন মস্ত লোক মনে করা, এই সকলকে তোমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ বলিয়া জান।

তোমরা সিংহাসনস্থ বড় বড় রাজা মহারাজার চেয়ে নিজেকে উচুঁ মনে করিতেছ—তাহার কারণ, তোমাদের আত্মম্ভরিতা নামক লাঙ্গুলের প্রসরটা অত্যন্ত অধিক—নিজ-রচিত কুণ্ডলিত লাঙ্গুল-সিংহাসনের উপর বসিয়া দূরবীক্ষণের উল্টা দিক দিয়া জগৎ সংসারকে দেখিতেছ। তোমাদের শরীরের আয়তন অধিক নহে, কিন্তু লেজ হইতে মাপিলে অনেকটা হয়। বিজ্ঞতার হৃদয় যদি এতটা প্রশস্ত হয় যে পরকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলে তাহার বক্ষে স্থান কুলায়, কুঞ্চিত-চর্ম্ম সংশয়ের নাম যদি বিজ্ঞতা না হয়, তবে সেই বিজ্ঞতা উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিব। তোমাদের বিজ্ঞতায় যে সূর্য্যের আলো নাই, বসন্ত কাননের শ্যামল বর্ণ নাই। তোমাদের বিজ্ঞতা সমুদয় জগৎকে অবিশ্বাস করিয়া অবশেষে একটি দুই হাত পরিমাণ ডোবার মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করিয়াছে ও আপনাকে সমুদ্রের চেয়ে গভীর মনে করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের হাসিকে চপলতা জ্ঞান করিতেছে, অনবরত পচিয়া উঠিতেছে, ও মুখটা আঁধার করিয়া সুগম্ভীর চেহারা বাহির করিতেছে! তোমাদের বিজ্ঞতার প্রাণটা একরত্তি, তাহাকে ছুঁইলেই কচ্ছপের মত সে নিজের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে; তোমাদের বিজ্ঞতার হাসিতে কৃপণতা, তাহার ভাষায় দুর্ভিক্ষ, তাহার আলিঙ্গন কাঁকড়ার আলিঙ্গনের মত, জিনিষ কিনিয়া সে কাণাকড়ি দিয়া তাহার দাম শোধ করে! এ বিজ্ঞতা লইয়া তোমরাই গর্ব্ব কর!

যে বিজ্ঞ সদনুষ্ঠানকে উপহাস করে, তাহা অপেক্ষা যে সরল ব্যক্তি সদনুষ্ঠানে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে সে মহৎ; যে মশক হস্তীকে বিব্রত করিয়া তোলে সে মশক হস্তীর চেয়ে বড় নহে—যে

পাঁকে সৎপথগামী সাধুর পা বসিয়া গেছে, সে পাঁকের জাঁক করিবার বিষয় কিছুই নাই। সংশয় করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, অসৎ অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া অনেক বিজ্ঞ অনেক সৎকার্য্যকে অঙ্কুরে দলিত করিয়া দিয়াছেন, অনেক তরুণ হৃদয়ের নবীন আশাকে তাঁহাদের হাস্যের বিদ্যুতাঘাতে চিরকালের জন্য দগ্ধ করিয়াছেন, অনেক উন্মুখ প্রতিভাকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করিয়া হয়ত পৃথিবীর এক একটা শতাব্দীকে অনুর্ব্বর মরুময় করিয়া দিয়াছেন—ইহাঁরা যদি এই সকল দলিত অঙ্কুর, দগ্ধ আশা, ভগ্ন হৃদয় স্তূপাকৃতি করিয়া নিজের কীর্ত্তি-স্তম্ভ রচনা করেন তবে কি কোন পিরামিড্ আয়তনে তাহার সম-কক্ষ হইতে পারে? রোগ দুর্ভিক্ষের সহোদর বিজ্ঞতা শ্মশানের ভস্ম দিয়া একটা উৎসবাগার নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেখানে অস্থিকঙ্কালের নৃত্য হইতেছে, হৃদয় শোণিতের মদ্যপান চলিতেছে, খরধার রসনা-খড়্গে আশা উদ্যমের বলি হইতেছে; আইস, যাহাদের হৃদয় আছে, আমরা প্রকৃতি মাতার উৎসবালয়ে যাই; সেখানে জীবনের অভিনয় হইতেছে, সেখানে সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হইতেছে, সেখানে মাপাজোকা কার্পণ্য নাই, সেখানে বাঁকাচোরা অনুদারতা নাই—সেখানে দুইমুখা প্রাণ নাই। এ সকল বিজ্ঞলোকদের সহিত আমাদের পোষাইবে না—আমরা ইহাদের চিনিতে পারিব না, ইহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারিব না—ইহারা উপদেশ দিবার সময় বড় বড় নীতিকথা বলে, কিন্তু ইহাদের মনে পাপ আছে, ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে সংক্রামক রোগ!

মেঘনাদবধ কাব্য।

সকলেই কিছু নিজের মাথা হইতে গড়িতে পারে না, এই জন্যই ছাঁচের আবশ্যক হয়। সকলেই কিছু কবি নহে এই জন্য অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্তু গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এই জন্যই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ রাগিণী গাহিতে পারেন।

হৃদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে, যে, যখনি তাহার ফুল-বাগানে বসন্তের বাতাস বয়, তখনি তার গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কুঁড়ি ধরে, আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যার প্রাণে ফুল বাগান নাই, যার প্রাণে বসন্তের বাতাস বয় না, সে কি করে? সে প্যাটার্ণ্ কিনিয়া চোখে চসমা দিয়া পশমের ফুল তৈরি করে।

আসল কথা এই, যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই। অতএব উভয়কে এক নামে ডাকা উচিত হয় না।

কিন্তু প্রভেদ জানা যায় কি করিয়া? উপায় আছে। যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন; তিনি নিজেকেই কখন বা রামরূপে, কখন বা রাবণরূপে কখন বা হ্যাম্‌লেটরূপে কখন বা ম্যাক্‌বেথরূপে পরিণত করিতে পারেন—সুতরাং অবস্থা-বিভেদে প্রকৃতিবিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন! আর যিনি গড়েন, তিনি পরকে গড়েন, সুতরাং তাঁর একচুল এদিক ওদিক করি-

বার ক্ষমতা নাই ;—ইঁহাদের কেবল কেরাণীগিরি করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না। আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি বলেন, কারণ, আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এই জন্যই তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থই তাহাই।

নকল-নবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন, তাহার মর্ম্ম সকল সময়ে বুঝিতে না পারিয়াই ধরা পড়েন। বাহ্য আকারের প্রতিই তাঁহাদের অত্যন্ত মনোযোগ, তাহাতেই তাঁহাদের চেনা যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি, সকল গুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা না একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণতঃ লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে ত কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণীনির্দ্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারি প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান্ ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহনকালে দ্রৌপদী ও ভীমার্জ্জুন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাণ্ডব-

দিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন, হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাই-বার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায়, যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এত দিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদ-য়ের মধ্যে একটা বেগবান্ অনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল, তখনি সে উদ্যমের কার্য্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমী মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জ্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে; ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরো নাবিয়া আসা যাক্, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দনন্দিনীত এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল;—আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই

নিদারুণ অশুভ-বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম—বাকীটুকু কেবল চোক বুজিয়া ভাবিলাম—ইহাই ট্র্যাজেডি! অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে সেমিকোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্র্যাজেডি লিখিতে যান, তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফরমাস দেন, ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে সুরু করেন।

এপিক্ (Epic) শব্দটা লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে। এপিক্ বলিতে লোকে সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকে, একটা মারামারী কাটাকাটীর ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই, তাহা আর এপিক্ হইবে কি করিয়া? আমরা যতগুলি বিখ্যাত এপিক্ দেখিয়াছি তাহার প্রায় সব গুলিতেই যুদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহাই বলিয়া এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা ভাল হয় না, যে, যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেহ এপিক্ লেখে, তবে তাহাকে এপিক্ বলিব না! এপিক্ কাব্য লেখার আরম্ভ হইল কি হইতে? কবিরা এপিক্ লেখেন কেন? এখনকার কবিরা যেমন "এস, একটা এপিক্ লেখা যাক্" বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক্ লিখিতে বসেন, প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেসিয়ান ছিল না।

মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না; তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন এক জন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন,

মনুষ্য-চরিত্রের উদার-মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দ্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য-কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য! মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনা কালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কি ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ত্ব বলিত। আমরা দেখিতেছি, হোমরের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ত্ব। বাহুবলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়ডের নায়ক ও যুদ্ধ বর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি, বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল—কেবল মাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখ, একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্রপ্রবৃত্তি; আর রামায়ণে দেখ, একদিকে রামের, সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের, প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসার ত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ ঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতে প্রমাণ

হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে, কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে—যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশিরাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিরিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধবর্ণনামাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে, যাহারা পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।

হেম বাবুর বৃত্র-সংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাব্যের সর্ব্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ আট নয় সর্গ ধরিয়া, সাত আটশ পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্ত্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্ব্বত্র চরিত্র-বিকাশ, চরিত্র-মহত্ত্ব দেখিতে চাই। মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে—কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি

যদি বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতির কবিত্ব জগতে না জন্মিয়া ভিন্ন দেশীয় কবিত্ব-জগতে জন্মিতাম, তাহা হইলেও আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন; আমরা সকল সময়ে তাহা জানিতেও পারি না—অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, আমাদের কার্য্য কত নিয়মিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, জানিতেই পাই না। সেই সকল অমর সহচর-সৃষ্টিই মহাকবিদের কাজ। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দ্দিকব্যাপী সেই কবিত্বজগতে মাইকেল কয় জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কোন্ লেখাটাকে মহাকাব্য বল?

আর একটা কথা বক্তব্য আছে—মহৎ চরিত্র যদিবা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন—তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎচরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন "I despise Ram and his rabble" সেটা বড় যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুব-জ্যোতি সূর্য্যের ন্যায় চিরদিন

পৃথিবীকে কিরণদান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কাবর্ষণ করিয়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে!

একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্যচরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাঁদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বান-সঙ্গীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি, হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল;—মাইকেল ভাবিলেন মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, অমনি সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ নরক বর্ণনা আছে, অমনি জোর-জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতারণ করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে তুলনাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটা-

কতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া, মহাকাব্যের একটা কাঠাম প্রস্তুত করিয়া মহাকাব্য লিখিতে বসেন; যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহল বশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় অনন্যপূর্ব্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয় দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য এবং সে কৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না।

আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম, তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম, তাহা মহাকাব্যই নয়।

হে বঙ্গ মহাকবিগণ! লড়াই বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না, লড়াই বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মানুষ হইতে শিখাও।

নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি।

একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি। কথাটা খুব নূতনতর। সচরাচর লোকে কবি বলিতে এমন বুঝে না। সচরাচর লোকে যাহা বলে তাহার বিপরীত একটা কথা শুনিলে অনেক সময় আমাদিগের ভারি ভাল লাগিয়া যায়। যাহার মনোবৃত্তি আছে সেই কবি, এ কথাটা এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়। কবি শব্দের ঐরূপ অতি-বিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাষাণ হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমন কি নীরব-কবি বলিয়া একটি কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, ও সে কথা দিনে দিনে খুব চলিত হইয়া আসিতেছে। এতদূর পর্য্যন্ত চলিত হইয়াছে যে, আজ যদি আমি এমন একটা পুরাতন কথা বলি যে, নীরব-কবি বলিয়া একটা কোন পদার্থই নাই, তাহা হইলে আমার কথাটাই লোকের নূতন বলিয়া ঠেকে। আমি বলি কি, যে নীরব সেই কবি নয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে, আমার যা' মত অধিকাংশ লোকেরই আন্তরিক তাহাই মত। লোকে বলিবে "ও কথা ত সকলেই বলে, উহার উল্টাটা যদি কোন প্রকারে প্রমাণ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড় ভাল লাগে।" ভাল ত লাগে, কিন্তু বিষয়টা এমনতর যে, তাহাতে একটা বই দুইটা কথা উঠিতে পারে না। কবি কথাটা এমন একটা সমস্যা নয় যে তাহাতে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খেলান যায়, "বীজ হইতে বৃক্ষ

কি বৃক্ষ হইতে বীজ” এমন একটা তর্কের খেলেনা নয়। ভাব-প্রকাশের সুবিধার জন্য লোকসাধারণে একটি বিশেষ পদার্থের একটি বিশেষ নামকরণ করিয়াছে, সেই নামে তাহাকে সকলে ডাকিয়া থাকে ও অনেক দিন হইতে ডাকিয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া আর তর্ক কি হইতে পারে? (লোকে কাহাকে কবি বলে? যে ব্যক্তি, বিশেষ শ্রেণীর ভাব সমূহ, (যাহাকে আমরা কবিতা বলি) ভাষায় প্রকাশ করে।* নীরব ও কবি দুটি অন্যোন্য-বিরোধী কথা, তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চাও, তবে এমন একটি পরস্পর-ধ্বংশী দম্পতির সৃষ্টি হয়, যে, শুভদৃষ্টির সময় পরস্পর চোখোচোখি হইবামাত্রেই উভয়ে প্রাণত্যাগ করে। উভয়েই উভয়ের পক্ষে ভস্মলোচন। এমনতর চোখোচোখিকে কি অশুভ দৃষ্টি বলাই সঙ্গত নয়, অতএব এমনতর বিবাহ কি না দিলেই নয়?) এমন হয় বটে, যে, তুমি যাহাকে কবি বল, আমি তাহাকে কবি বলি না; এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তুমি বলিতে পার বটে যে, “যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন লোকে কবি বলিয়া থাকে তখন কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কবি বলিতে সকলেই এক অর্থ বুঝে?” আমি বলি কি, একই অর্থ বুঝে। যখন পদ্মপুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাম বাবুকে তুমি কবি বলিতেছ, আমি কবি বলিতেছি না, ও কবিতাচন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যাম বাবুকে আমি কবি বলিতেছি, তুমি বলিতেছ না, তখন

* প্রবন্ধটির মধ্যে আড়ম্বর করিয়া কবিতা কথাটির একটি দুরূহ সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে বসা সাজে না বলিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম।

তোমাতে আমাতে এই তর্ক যে, "রাম বাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে ?" বা "শ্যাম বাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে ?" রামবাবু ও শ্যামবাবু এক স্কুলে পড়েন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কে ফাষ্টক্লাসে পড়েন, কে লাষ্ট-ক্লাশে পড়েন তাহাই লইয়া কথা। রামবাবু ও শ্যামবাবু যে এক স্কুলে পড়েন, সে স্কুলটি কি ? না প্রকাশ করা। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় ? না প্রকাশ করা লইয়া। বৈসাদৃশ্য কোথায় ? কিরূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা লইয়া। তবে, ভাল কবিতাকেই আমরা কবিতা বলি, কবিতা খারাপ হইলে তাহাকে আমরা মন্দ কবিতা বলি, সুকবিতা হইতে আরও দূরে গেলে তাহাকে আমরা কবিতা না বলিয়া শ্লোক বলিতে পারি, ছড়া বলিতে পারি, যাহা ইচ্ছা। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা মানুষ বলি, তাহার কাছাকাছি যে আসে তাহাকে বনমানুষ বলি, মানুষ হইতে আরো তফাতে গেলে তাহাকে মানুষও বলি না, বনমানুষও বলিনা, তাহাকে বানর বলি। এমন তর্ক কখনো শুনিয়াছ যে Wordsworth শ্রেষ্ঠ কবি না ভজহরি (যে ব্যক্তি লেখনীর আকার কিরূপ জানে না) শ্রেষ্ঠ কবি ? অতএব এটা দেখিতেছ, (কবিতা প্রকাশ না করিলে কাহাকেও কবি বলা যায় না।) তোমার মতে ত বিশ্ব-সুদ্ধ লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে। এমন ব্যক্তি নাই, যাহার মনে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত না রহিয়াছে, তবে কেন মনুষ্যজাতির আর এক নাম রাখ না চিত্রকর ? আমার কথাটি অতি সহজ কথা। আমি বলি যে, যে ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে, ও যে ব্যক্তি

ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না, সেও কবি নহে। যাঁহারা নীরব কবি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বচরাচরকে কবিতা বলেন। এ সকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলঙ্কার-শূন্য গদ্যে অথবা তর্কস্থলে বলিলে কি ভাল শুনায়? একটা নামকে এরূপ নানা অর্থে ব্যবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার দুইটা ডানা বাহির হয়, এক স্থানে ধরিয়া রাখা যায় না ও ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, "আয়" বলিয়া ডাকিলেই খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না। আমার কথাটা এই যে, আমার মনে আমার প্রেয়সীর ছবি আঁকা আছে বলিয়াই আমি কিছু চিত্রকর নই, ও ক্ষমতা থাকিলেই আমার প্রেয়সীকে আঁকা যাইতে পারিত বলিয়া আমার প্রেয়সী একটি চিত্র নহেন।

অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ কবি, ও বালকেরা অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি। এ মতের পূর্ব্বোক্ত মতটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার হয় নাই। তথাপি তর্ককালে অনেকেরই মুখে এ কথা শুনা যায়। বালকেরা যে কবি নয়, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কবিতাময় ভাষায় ভাব প্রকাশ করে না। অনেকে কবিত্ব অনুভব করেন, কবিত্ব উপভোগ করেন, যদিবা বলপূর্ব্বক তুমি তাঁহাদিগকেও কবি বল তথাপি বালক-দিগকে কবি বলা যায় না। বালকেরা কবিত্ব অনুভব করে না, কবিত্ব উপভোগ করে না, অর্থাৎ বয়স্ক লোকদের মত করে না। অনুভব ত সকলেই করিয়া থাকে, পশুরাও ত সুখ দুঃখ অনুভব করে।

কিন্তু কবিত্ব অনুভব কয়জন লোকে করে? যথার্থ সুন্দর ও যথার্থ কুৎসিত কয়জন ব্যক্তি পরখ করিয়া তফাৎ করিয়া দেখে ও বুঝে? অধিকাংশ লোক সুন্দর চিনিতে ও উপভোগ করিতেই জানে না। সুন্দর বস্তু কেন সুন্দর তাহা বুঝিতে পারা, অন্য সমস্ত সুন্দর বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে তাহার যথাযোগ্য আসন দেওয়া, একটা সুন্দর বস্তু হইতে দশটা সুন্দর বস্তুর কথা মনে পড়া, অবস্থা-বিভেদে একটি সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য-বিভেদ কল্পনা করিতে পারা কি সকলের সাধ্য? সকল চক্ষুই কি শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী কি-একটি দেখিতে পায়? অল্পই হউক আর অধিক হউক কল্পনাত সকলেরই আছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জ্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে। পূর্ণচন্দ্র যে হাসে, বা জ্যোৎস্না যে ঘুমায়, এ কয়জন বালকের কল্পনায় উদিত হয়? একজন বালক যদি অসাধারণ কাল্পনিক হয়, তবে পূর্ণচন্দ্রকে একটা আস্ত লুচি বা অর্দ্ধচন্দ্রকে একটি ক্ষীরপুলি মনে করিতে পারে। তাহাদের কল্পনা সুসংলগ্ন নহে; কাহার সহিত কাহার যোগ হইতে পারে, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে পাশাপাশি বসাইলে পরস্পর পরস্পরের আলোকে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে, কোন্ দ্রব্যকে কি ভাবে দেখিলে তাহার মর্ম্ম, তাহার সৌন্দর্য্য চক্ষে বিকাশ পায়, এ সকল জানা অনেক শিক্ষার কাজ। একটি দ্রব্য অনেক ভাবে দেখা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এক ভাবে জগৎ দেখেন, দার্শনিকেরা একভাবে দেখেন

ও কবিরা আর এক ভাবে দেখেন। তিন জনে তিন প্রকার পদ্ধতিতে একই বস্তু দেখিতে পারেন। তুমি কি বল, উহার মধ্যে দুই প্রকার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে শিক্ষার আবশ্যক করে, আর তৃতীয়টীতে করে না? শুদ্ধ করে না তাহাই নয়, শিক্ষাতেই তাহার বিনাশ! কোন্ দ্রব্য কোন্ শ্রেণীর, কিসের সহিত তাহার ঐক্য ও কিসের সহিত তাহার অনৈক্য, তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি তিন জনেরই কাজ। তবে একটা দ্রব্যের তিনটি দিক আছে, তিন জন তিন বিভিন্ন দিকের ভার লইয়াছেন। তিন জনের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ, আর কিছু প্রভেদ আছে কি? অনেক ভাল ভাল কবি যে ভাবের পার্শ্বে যে ভাব বসানো উচিত, স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। Marlowর Come live with me and be my love" নামক সুবিখ্যাত কবিতাতে ইহা লক্ষিত হয়।

"হ'বি কি আমার প্রিয়া, র'বি মোর সাথে?
অরণ্য, প্রান্তর, নদী, পর্ব্বত গুহাতে
যত কিছু, প্রিয়তমে, সুখ পাওয়া যায়,
দুজনে মিলিয়া তাহা ভোগ করি আয়!
শুনিব শিখরে বসি পাখী গায় গান,
নদীর শবদ সাথে মিশাইয়া তান;
দেখিব চাহিয়া সেই তটিনীর তীরে
রাখাল গরুর পাল চরাইয়া ফিরে।

রচি দিব গোলাপের শয্যা মনোমত ;
সুরভি ফুলের তোড়া দিব কত শত ;
গড়িব ফুলের টুপি পরিবি মাথায়,
আঙিয়া রচিয়া দিব গাছের পাতায়।
লয়ে মেষশিশুদের কোমল পশম
বসন বুনিয়া দিব অতি অনুপম ;
সুন্দর পাদুকা এক করিয়া রচিত,
খাঁটি সোনা দিয়ে তাহা করিব খচিত।
কটি-বন্ধ গড়ি দিব গাঁথি তৃণ-জাল,
মাঝেতে বসায়ে দিব একটি প্রবাল।
এই সব সুখ যদি তোর মনে ধরে
হ' আমার প্রিয়তমা, আয় মোর ঘরে।
হস্তি-দন্তে গড়া এক আসনের পরে,
আহার আনিয়া দিবে দু জনের তরে,
দেবতার উপভোগ্য, মহার্ঘ্য এমন,
রজতের পাত্রে দোঁহে করিব ভোজন।
রাখাল-বালক যত মিলি একত্তরে
নাচিবে গাইবে তোর আমোদের তরে।
এই সব সুখ যদি মনে ধরে তব,
হ' আমার প্রিয়তমা, এক সাথে রব'।

এ কবিতাতে একটি বিশেষ ভাবকে সমগ্র রাখা হয় নাই। মাঝ-খানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যে বিশাল কল্পনায় একটি ভাব সমগ্র প্রতি-

বিস্মিত হয়, যাহাতে যোড়াতাড়া দিতে হয় না, সে কল্পনা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। অরণ্য, পর্ব্বত, প্রান্তরে যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন, যে ব্যক্তি গোলাপের শয্যা ফুলের টুপি ও পাতার আঙিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইতেছে সে স্বর্ণ-খচিত পাদুকা, রজতের পাত্র, হস্তি-দন্তের আসন পাইবে কোথায়? তৃণ-নির্ম্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়? কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তি-গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে, যে, আমাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়। *

---

* অনেকে তর্ক করেন যে, গণেশকে দুর্গা এক একবার করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া ধনপতি গজাহার ও উদ্গীরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ কবিকঙ্কণচণ্ডীতেই আছে, যে, চৌষট্টি যোগিনী পদ্মের দলরূপ ধারণ করিল, ও জয়া হস্তিনী রূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কেহ বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিস্ময় ভাবের উদ্দীপন করা, তখন, বর্ণনা যাহাতে অদ্ভুত হয়, তাহারই প্রতি কবির লক্ষ্য। কিন্তু এ কথার কোন অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিস্ময় রসের কোন মনান্তর নাই।

যখন কবি অগাধ সমুদ্রের মধ্যে মরালশোভিত কুমুদ কহ্লার পদ্ম বনের মধ্যে এক রূপসী ষোড়শী প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সমস্তই সুন্দর; নীল জল, সুকুমার পদ্ম, পুষ্পের সুগন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন, ইত্যাদি, তখন মধ্য হইতে এক গজাহার আনিয়া আমাদের কল্পনায় অমন একটা নিদারুণ আঘাত দিবার তাৎপর্য্য কি? সুন্দর পদার্থ যেমন কবিত্ব-পূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে, এমন কি আর কিছুতে পারে? অপার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা ষোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে?

শিক্ষিত, সংযত, মার্জ্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ কোন মতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না।

কল্পনারও শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব অলৌকিক কল্পনা করিতে ভাল বাসে; বক্র দর্পণে মুখ দেখিলে নাসিকা পরিমাণাধিক বৃহৎ এবং কপাল ও চিবুক নিতান্ত হ্রস্ব দেখায়। অশিক্ষিতদের কুগঠিত কল্পনা-দর্পণে স্বাভাবিক দ্রব্য যাহা কিছু পড়ে তাহার পরিমাণ ঠিক থাকে না; তাহার নাসা বৃহৎ ও তাহার কপাল খর্ব্ব হইয়া পড়ে। তাহারা অসঙ্গত পদার্থের জোড়াতাড়া দিয়া এক একটা বিকৃতাকার পদার্থ গড়িয়া তোলে। তাহারা শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী ভাব দেখিতে পায় না। তথাপি যদি বল' বালকেরা কবি, তবে নিতান্ত বালকের মত কথা বলা হয়। প্রাচীন কালে অনেক ভাল কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, এই মতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ রূপে কবি। তুমি বল দেখি, ওটাহিটি দ্বীপবাসী বা এস্কুই-মোদের ভাষায় কয়টা পাঠ্য কবিতা আছে? এমন কোন্ জাতির মধ্যে ভাল কবিতা আছে, যে জাতি সভ্য হয় নাই। যখন রামায়ণ মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তখন প্রাচীনকাল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত কাল কি? রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া কাহারো মনে কি সে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে মহা মহা কবিরা ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতায় কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব লক্ষিত হয় না? Copleston কহেন „Never has there been a city of which its people might

be more justly proud, whether they looked to its past or its future than Athens in the days of Eschylus."

অনেকে কল্পনা করেন যে, অশিক্ষিত অবস্থায় কবিত্বের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার একটি কারণ এই যে, তাঁহাদের মতে একটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিলে তাহাতে কল্পনার বিচরণের সহস্র পথ থাকে। সত্য একটি মাত্র, মিথ্যা অগণ্য। অতএব মিথ্যায় কল্পনার যে রূপ উদরপূর্ত্তি হয়, সত্যে সে রূপ হয় না। পৃথিবীতে অখাদ্য যত আছে, তাহা অপেক্ষা খাদ্য বস্তু অত্যন্ত পরিমিত। একটি খাদ্য যদি থাকে ত সহস্র অখাদ্য আছে। অতএব এমন মত কি কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছ যে, অখাদ্য বস্তু আহার না করিলে মনুষ্য বংশ ধ্বংশ হইবার কথা?

প্রকৃত কথা এই যে, সত্যে যত কবিতা আছে, মিথ্যায় তেমন নাই। শত সহস্র মিথ্যার দ্বারে দ্বারে কল্পনা বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু এক মুষ্টি কবিতা সঞ্চয় করিতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু একটি সত্যের কাছে যাও, তাহার দশগুণ অধিক কবিতা পাও কি না দেখ দেখি? কেনই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে বল? আমরা ত প্রকৃতির কাছেই কবিতা শিক্ষা করিয়াছি, প্রকৃতি কখনো মিথ্যা কহেন না। আমরা কি কখনো কল্পনা করিতে পারি যে, লোহিত বর্ণ ঘাসে আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইতেছে? বল দেখি, পৃথিবী নিশ্চল রহিয়াছে ও আকাশে অগণ্য তারকারাজি নিশ্চল ভাবে খচিত রহিয়াছে, ইহাতে অধিক কবিত্ব, কি সমস্ত তারকা নিজের পরিবার লইয়া ভ্রমণ করিতেছে তাহাতে অধিক কবিত্ব; এমনি তাহাদের তালে

তালে পদক্ষেপ যে, এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া দিতে পারেন, কাল যে গ্রহ অমুক স্থানে ছিল আজ সে কোথায় আসিবে। প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পনা প্রকৃতি অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণ বস্তু সৃজন করিতে অসমর্থ, দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে অবস্থার মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভূত সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না।

অনেক মিথ্যা, কবিতায় আমাদের মিষ্ট লাগে। তাহার কারণ এই যে, যখন সেগুলি প্রথম লিখিত হয় তখন তাহা সত্য মনে করিয়া লিখিত হয়, ও সেই অবধি বরাবর সত্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আজ তাহা আমি মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে সে এমনি শিকড় বসাইয়াছে যে, সেখানে হইতে তাহাকে উৎপাটন করিবার যো নাই। কবি যে ভূত বিশ্বাস না করিয়াও ভূতের বর্ণনা করেন তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহার অর্থ এই যে, ভূত বস্তুতঃ সত্য না হইলেও আমাদের হৃদয়ে সে সত্য। ভূত আছে বলিয়া কল্পনা করিলে যে, আমাদের মনের কোন্ থানে আঘাত লাগে, কত কথা জাগিয়া উঠে, অন্ধকার, বিজনতা, শ্মশান, এক অলৌকিক পদার্থের নিঃশব্দ অনুসরণ, ছেলেবেলাকার কত কথা মনে উঠে এ সকল সত্য যদি কবি না দেখেন ত কে দেখিবে?

সত্য এক হইলেও যে, দশ জন কবি সেই এক সত্যের মধ্যে দশ প্রকার বিভিন্ন কবিতা দেখিতে পাইবেন না তাহা ত নহে। এক সূর্য্য কিরণে পৃথিবী কত বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখ দেখি! নদী যে বহিতেছে, এই সত্য টুকুই কবিতা নহে। কিন্তু এই বহমানা

নদী দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ভাববিশেষের জন্ম হয় সেই সত্যই যথার্থ কবিতা।) এখন বল দেখি, এক নদী দেখিয়া সময়ভেদে কত বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়! কখনো নদীর কণ্ঠ হইতে বিষণ্ণ গীতি শুনিতে পাই, কখনো বা তাহার উল্লাসের কলস্বর, তাহার শত তরঙ্গের নৃত্য আমাদের মনকে মাতাইয়া তোলে। জ্যোৎস্না কখনো সত্য সত্যই ঘুমায় না, অর্থাৎ সে, দুটি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে না, ও জ্যোৎস্নার নাসিকা-ধ্বনিও কেহ কখনো শুনে নাই। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না দেখিলে মনে হয় যে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে ইহা সত্য। জ্যোৎস্নার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তন্ন তন্ন রূপে আবিষ্কৃত হউক; এমনো প্রমাণ হউক্ যে জ্যোৎস্না একটা পদার্থই নহে, তথাপি লোকে বলিবে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে। তাহাকে কোন্ বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে?

সঙ্গীত ও কবিতা।

বলা বাহুল্য, আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাহাকে শুদ্ধ মাত্র কথার সমষ্টি স্বরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ। কথা ভাবের আশ্রয় স্বরূপ। আমরা সঙ্গীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সঙ্গীত স্বরের রাগ রাগিণী নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগ রাগিণী। আমাদের কথা এই যে,—কবিতা

যেমন ভাবের ভাষা, সঙ্গীতও তেমনি ভাবের ভাষা। তবে, কবিতা ও সঙ্গীতে প্রভেদ কি? আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথা কহিয়া থাকি, তাহা যুক্তির ভাষা। "হাঁ" কি "না," ইহা লইয়াই তাহার কারবার। "আজ এখানে গেলাম," "কাল সেখানে গেলাম," "আজ সে আসিয়াছিল," "কাল সে আসে নাই," "ইহা রূপা," "উহা সোনা।" ইত্যাদি। এ সকল কথার উপর যুক্তি চলে। "আজ আমি অমুক জায়গায় গিয়াছিলাম," ইহা আমি নানা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি। দ্রব্য-বিশেষ রূপা কি সোনা ইহাও নানা যুক্তির সাহায্যে আমি অন্যকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি। অতএব, সচরাচর আমরা যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করি, তাহা বিশ্বাস করা না করা যুক্তির ন্যূনাধিক্যের উপর নির্ভর করে। এই সকল কথোপকথনের জন্য আমাদের প্রচলিত ভাষা—অর্থাৎ গদ্য নিযুক্ত রহিয়াছে।

কিন্তু বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া এক, আর উদ্রেক করাইয়া দেওয়া স্বতন্ত্র। বিশ্বাসের শিকড় মাথায়, আর উদ্রেকের শিকড় হৃদয়ে। এই জন্য বিশ্বাস করাইবার জন্য যে ভাষা উদ্রেক করাইবার জন্য সে ভাষা নহে। যুক্তির ভাষা গদ্য আমাদের বিশ্বাস করায়, আর কবিতার ভাষা পদ্য আমাদের উদ্রেক করায়। যে সকল কথায় যুক্তি খাটে, তাহা অন্যকে বুঝান অতিশয় সহজ, কিন্তু যাহাতে যুক্তি খাটে না, যাহা যুক্তির আইন কানুনের মধ্যে ধরা দেয় না, তাহাকে বুঝান' সহজ ব্যাপার নহে। "কেন" নামক একটা চষ্‌মা-চক্ষু, দুর্দ্দান্ত রাজাধিরাজ যেমনি কৈফিয়ৎ তলব করেন,

অমনি সে আসিয়া হিসাব নিকাশ করিবার জন্য হাজির হয় না। যে সকল সত্য মহারাজ "কেন"র প্রজা নহে, তাহাদের বাসস্থান কবিতায়। আমাদের হৃদয়-গত সত্য সকল "কেন"কে বড় একটা কেয়ার করে না। যুক্তির একটা ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে, কিন্তু আমাদের রুচির অর্থাৎ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের আজ পর্য্যন্ত একটা ব্যাকরণ তৈয়ারি হইল না। তাহার প্রধান কারণ, সে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে নির্ভয়ে বাস করিয়া থাকে—এবং সে দেশে "কেন" আদালতের ওয়ারেণ্ট্ জারী হইতে পারে না। একবার যদি তাহাকে যুক্তির সামনে খাড়া করিতে পারা যাইত, তাহা হইলেই তাহার ব্যাকরণ বাহির হইত। অতএব, যুক্তি যে সকল সত্য বুঝাইতে পারে না বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, কবিতা সেই সকল সত্য বুঝাইবার ভার নিজস্কন্ধে লইয়াছে। এই নিমিত্ত স্বভাবতই যুক্তির ভাষা ও কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় এমন হয় যে, শত সহস্র প্রমাণের সাহায্যে একটা সত্য আমরা বিশ্বাস করি মাত্র কিন্তু আমাদের হৃদয়ে সে সত্যের উদ্রেক হয় না। আবার অনেক সময়ে একটি সত্যের উদ্রেক হইয়াছে, শত সহস্র প্রমাণে তাহা ভাঙ্গিতে পারে না। এক জন নৈয়ায়িক যাহা পারেন না, এক জন বাগ্মী তাহা পারেন। নৈয়ায়িক ও বাগ্মীতে প্রভেদ এই, নৈয়ায়িকের হস্তে যুক্তির কুঠার ও বাগ্মীর হস্তে কবিতার চাবী। নৈয়ায়িক কোপের উপর কোপ বসাইতেছেন, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিল না, আর বাগ্মী কোথায় একটু চাবী ঘুরাইয়া দিলেন, দ্বার খুলিয়া গেল। উভয়ের অস্ত্র বিভিন্ন।

আমি যাহা বিশ্বাস করিতেছি, তোমাকে তাহাই বিশ্বাস করান' আর আমি যাহা অনুভব করিতেছি, তোমাকে তাহাই অনুভব করান' —এ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করিতেছি, একটি গোলাপ সুগোল, আমি তাহার চারিদিক মাপিয়া জুকিয়া তোমাকে বিশ্বাস করাইতে পারি যে গোলাপ সুগোল,—আর আমি অনুভব করাইতে পারিনা যে, গোলাপ সুন্দর। তখন কবিতার সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়। গোলাপের সৌন্দর্য্য আমি যে উপভোগ করিতেছি, তাহা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তোমার মনেও সে সৌন্দর্য্য ভাবের উদ্রেক হয়। এই রূপ প্রকাশ করাকেই বলে কবিতা। চোখে চোখে চাহনির মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে করিয়া প্রেম ধরা পড়ে, অতিরিক্ত যত্ন করার মধ্যে যে যুক্তি আছে যাহাতে করিয়া প্রেমের অভাব ধরা পড়ে, কথা না কহার মধ্যে যে যুক্তি আছে যাহাতে অসীম কথা প্রকাশ করে, কবিতা সেই সকল যুক্তি ব্যক্ত করে।

সচরাচর কথোপকথনে যুক্তির যতটুকু আবশ্যক, তাহারই চূড়ান্ত আবশ্যক দর্শনে বিজ্ঞানে। এই নিমিত্ত দর্শন বিজ্ঞানের গদ্য কথোপকথনের গদ্য হইতে অনেক তফাৎ। কথোপকথনের গদ্যে দর্শন বিজ্ঞান লিখিতে গেলে যুক্তির বাঁধুনি আল্‌গা হইয়া যায়। এই নিমিত্ত খাঁটি নিভাঁজ যুক্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার চুল-চেরা তীক্ষ্ণ পরিষ্কার ভাষা নির্ম্মাণ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি সে ভাষা গদ্য বই আর কিছু নয়। কারণ যুক্তির ভাষাই নিরলঙ্কার সরল পরিষ্কার গদ্য।

আর আমরা সচরাচর কথোপকথনে যতটা অনুভাব প্রকাশ করি, তাহারই চূড়ান্ত প্রকাশ করিতে হইলে কথোপকথনের ভাষা হইতে একটা স্বতন্ত্র ভাষার আবশ্যক করে। তাহাই কবিতার ভাষা—পদ্য। অনুভাবের ভাষাই অলঙ্কারময়, তুলনাময় পদ্য। সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আঁকুবাঁকু করিতে থাকে—তাহার যুক্তি নাই, তর্ক নাই, কিছুই নাই। আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার তেমন সোজা রাস্তা নাই। সে নিজের উপযোগী নূতন রাস্তা তৈরি করিয়া লয়। যুক্তির অভাব মোচন করিবার জন্য সৌন্দর্য্যের শরণাপন্ন হয়। সে এমনি সুন্দর করিয়া সাজে, যে, যুক্তির অনুমতি-পত্র না থাকিলেও সকলে তাহাকে বিশ্বাস করে। এমনি তাহার মুখখানি সুন্দর, যে, কেহই তাহাকে "কে" "কি বৃত্তান্ত" "কেন" জিজ্ঞাসা করে না, কেহ তাহাকে সন্দেহ করে না, সকলে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া ফেলে, সে সৌন্দর্য্যের বলে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু নিরলঙ্কার যৌক্তিক সত্যকে প্রতিপদে বহুবিধ প্রমাণ সহকারে আত্মপরিচয় দিয়া আত্মস্থাপনা করিতে হয়, দ্বারীর সন্দেহ-ভঞ্জন করিতে হয়, তবে সে প্রবেশের অনুমতি পায়। অনুভাবের ভাষা ছন্দোবদ্ধ। পূর্ণিমার সমুদ্রের মত তালে তালে তাহার হৃদয়ের উত্থান পতন হইতে থাকে, তালে তালে তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকে। নিশ্বাসের ছন্দে, হৃদয়ের উত্থান পতনের ছন্দে তাহার তাল নিয়মিত হইতে থাকে। কথা বলিতে বলিতে তাহার বাধিয়া যায়, কথার মাঝে মাঝে অশ্রু পড়ে, নিশ্বাস পড়ে, লজ্জা আসে, ভয় হয়, থামিয়া যায়। সরল যুক্তির এমন তাল নাই, আবেগের দীর্ঘ-

নিশ্বাস পদে পদে তাহাকে বাধা দেয় না। তাহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, কিছুই নাই। এই নিমিত্ত, চূড়ান্ত যুক্তির ভাষা গদ্য, চূড়ান্ত অনুভাবের ভাষা পদ্য।

আমাদের ভাব প্রকাশের দুটি উপকরণ আছে—কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাব-প্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্ম্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রধান্য দিই ও সঙ্গীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই। যেমন, কথোপকথনে আমরা যে সকল কথা যেরূপ শৃঙ্খলায় ব্যবহার করি, কবিতায় আমরা সে সকল কথা সেরূপ শৃঙ্খলায় ব্যবহার করি না, কবিতায় আমরা বাছিয়া বাছিয়া কথা লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি—তেমনি কথোপকথনে আমরা যে সকল সুর যেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি, সঙ্গীতে সে সকল সুর সেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি না, সুর বাছিয়া বাছিয়া লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি। কবিতায় যেমন বাছা' বাছা' সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সঙ্গীতেও তেমনি বাছা বাছা সুন্দর সুরে ভাব প্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না। কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সঙ্গীতের সুর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সঙ্গীত অবিকল

কবিতার ন্যায়। সঙ্গীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার সুরের লীলা নিয়মিত হইতেছে। কথোপকথনের ভাষায় সুশৃঙ্খল ছন্দ নাই, কবিতায় ছন্দ আছে, তেমনি কথোপকথনের সুরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সঙ্গীতে তাল আছে। সঙ্গীত ও কবিতা উভয়ে ভাব প্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগী করিয়া লইয়াছে। তবে, কবিতা ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে যত খানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সঙ্গীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথার কোন আকর্ষণ নাই, না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এই জন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়-সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সঙ্গীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এক কালে যে দাস ছিল, আর এক কালে সেই প্রভু হইয়াছে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ—কিন্তু এ চক্র কি আর ফিরিবে না? যেমন ভারতবর্ষের ভূমি উর্ব্বরা হওয়াতেই ভারতবর্ষের অনেক দুর্দশা, তেমনি সঙ্গীতের ভূমি উর্ব্বরা হওয়াতেই সঙ্গীতের এমন দুর্দ্দশা। মিষ্টসুর শুনিবামাত্রই ভাল লাগে, সেই নিমিত্ত সঙ্গীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই—কিন্তু শুদ্ধ মাত্র কথার যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চ্চা করিতে হইয়াছে, সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সঙ্গীতের এমন অবনতি।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, কবিতা ও সঙ্গীতে আর কোন তফাৎ

নাই, কেবল ইহা ভাব প্রকাশের একটা উপায়, উহা ভাব প্রকাশের আর একটা উপায় মাত্র। কেবল অবস্থার তারতম্যে কবিতা উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়াছে ও সঙ্গীত নিম্ন-শ্রেণীতে পড়িয়া রহিয়াছে; কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাবই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সঙ্গীতে এখনো তাহা করা যায় না। কবি Matthew Arnold তাঁহার "Epilogue to Lessing's Laocoon" নামক কবিতায় চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতার যে প্রভেদ স্থির করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম নিজ ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন—চিত্রে প্রকৃতির এক মুহূর্ত্তের বাহ্য অবস্থা প্রকাশ করা যায় মাত্র। যে মুহূর্ত্তে একটি সুন্দর মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তটি মাত্র চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পর মুহূর্ত্তটি আর তাহাতে নাই। যে মুহূর্ত্তটি তাঁহার শিল্পের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্ত্ত সেই মুহূর্ত্তটি অবিলম্বে বাছিয়া লওয়া প্রকৃত চিত্রকরের কাজ। তেমনি মনের একটি মাত্র স্থায়ীভাব বাছিয়া লওয়া, ভাব-শৃঙ্খলের একটি মাত্র অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সঙ্গীতের কাজ। মনে কর,' আমি বলিলাম, "হায়!" কথাটা ঐখানেই ফুরাইল, কথায় উহার অপেক্ষা আর অধিক প্রকাশ করিতে পারে না। আমার হৃদয়ের একটি অবস্থাবিশেষ ঐ একটি মাত্র ক্ষুদ্র কথায় প্রকাশ হইয়া অবসান হইল। সঙ্গীত সেই "হায়" শব্দটি লইয়া তাহাকে বিস্তার করিতে থাকে, "হায়" শব্দের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিতে থাকে, "হায়" শব্দের হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর দুঃখ, যে অতৃপ্ত বাসনা, যে আশার জলাঞ্জলি প্রচ্ছন্ন আছে, সঙ্গীত তাহাই টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে থাকে, "হায়" শব্দের

প্রাণের মধ্যে যতটা কথা ছিল সবটা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লয়। কিন্তু কবিতার কাজ আরো বিস্তৃত। চিত্রকরের ন্যায় মুহূর্ত্তের বাহ্য-শ্রীও তাঁহার বর্ণনীয়, গায়কের ন্যায় ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসও তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া—জীবনের গতি-স্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়। ভাব হইতে ভাবান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হয়। ভাবের গঙ্গোত্রী হইতে ভাবের সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হয়। কেবলমাত্র স্থির আকৃতি তিনি চিত্র করেন না, এক সময়ের স্থায়ী ভাব মাত্র তিনি বর্ণনা করেন না, গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়।—অতএব ম্যাথিউ আর্ণল্ডের মতে চলনশাল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সঙ্গীতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সঙ্গীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা এই বলি যে, গতিশীল ভাব যে সঙ্গীতের পক্ষে একবারে অননুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সঙ্গীতের সে বয়স হয় নাই। সঙ্গীত ও কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখিনা, কেবল উন্নতির তারতম্য। উভয়ে যমজ ভ্রাতা, এক মায়ের সন্তান, কেবল উভয়ের শিক্ষার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে মাত্র।

দেখা গেল সঙ্গীত ও কবিতা এক শ্রেণীর। কিন্তু উভয়ের সহিত আমরা কতখানি ভিন্ন আচরণ করি, তাহা মনোযোগ দিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে। এখন সঙ্গীত যেরূপ হইয়াছে, কবিতা যদি সেইরূপ হইত, তাহা হইলে কি হইত? মনে কর এমন যদি নিয়ম হইত যে, যে কবিতায় চতুর্দ্দশ ছত্রের মধ্যে, বসন্ত, মলয়ানিল, কোকিল, সুধাকর, রজনীগন্ধা, টগর ও দুরন্ত এই কয়েকটি শব্দ বিশেষ শৃঙ্খলা অনু-

সারে পাঁচ বার করিয়া বসিবে, তাহারই নাম হইবে কবিতা বসন্ত ;—ও যদি কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ কবিদিগকে ফরমাস করিতেন, "ওহে চণ্ডিদাস, একটা কবিতা বসন্ত ছন্দ ত্রিপদী আওড়াও ত!" অমনি যদি চণ্ডিদাস আওড়াইতেন—

বসন্ত মলয়ানিল, রজনীগন্ধা কোকিল,
দুরন্ত টগর সুধাকর—
মলয়ানিল বসন্ত, রজনীগন্ধা দুরন্ত,
সুধাকর কোকিল টগর।

ও চারিদিক হইতে "আহা" "আহা" পড়িয়া যাইত, কারণ কথা-গুলি ঠিক নিয়মানুসারে বসান হইয়াছে; তাহা হইলে কবিতা কতকটা আধুনিক গানের মত হইত। ঐ কয়েকটি কথা ব্যতীত আর একটি কথা যদি বিদ্যাপতি বসাইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ধিক্ ধিক্ করিতেন ও তাঁহার কবি-তার নাম হইত "কবিতা জংলা বসন্ত।" এরূপ হইলে আমাদের কবিতার কি দ্রুত উন্নতিই হইত! কবিতার ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী বাহির হইত, বিদেশ-বিদ্বেষী জাতীয়-ভাবোন্মত্ত আর্য্যপুরুষগণ গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, উঃ, আমাদের কবিতায় কতগুলা রাগ রাগিণী আছে, আর অসভ্য ম্লেচ্ছদের কবিতায় রাগরাগিণীর লেশ মাত্র নাই।

আমরা যেমন আজ কাল নব-রসের মধ্যেই মারামারি করিয়া কবিতাকে বদ্ধ করিয়া রাখি না, অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত আড়ম্বর-পূর্ণ নামের প্রতি দৃষ্টি করি না—তেমনি সঙ্গীতে কতকগুলা নাম ও নিয়মের মধ্যেই যেন বদ্ধ হইয়া না থাকি। কবিতারও যে স্বাধীনতা আছে

সঙ্গীতেরও সেই স্বাধীনতা হউক, কারণ সঙ্গীত কবিতার ভাই। যেমন সন্ধ্যার বিষয়ে কবিতা রচনা করিতে গেলে কবি সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করিতে থাকেন ও তাঁহার প্রতি কথায় সন্ধ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠে, তেমনি সন্ধ্যার বিষয়ে গান রচনা করিতে গেলে রচয়িতা যেন চোক কান বুজিয়া পুরবী না গাহিয়া যান, যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেন, তাহা হইলে অবসান দিবসের ন্যায় তাঁহার সুরও আপনা-আপনি নামিয়া আসিবে, মুদিয়া আসিবে, ফুরাইয়া আসিবে। প্রত্যেক গীতিকবিদের রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হইতে থাকিবে। তাহা হইলে গানের বাল্মীকি গানের কালিদাস জন্ম গ্রহণ করিবেন।

বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা।

চারিদিকে লোক জন, চারিদিকেই হাট বাজার, সদা সর্ব্বদাই কাজকর্ম্ম, বিষয় আশয়ের চিন্তা। সম্মুখে দেনাদার, পশ্চাতে পাওনা-দার, দক্ষিণে বিষয় কর্ম্ম, বামে লোক-লৌকিকতা, পদতলে গত কল্যের খরচ, মাথার উপরে আগামী কল্যের জন্য জমা। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি,—পৃথিবীর মৃত্তিকা; দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ; স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ; আরম্ভ, স্থিতি ও অবসান। মানুষের মন কোথায় গিয়া বিশ্রাম করিবে? এমন ঠাঁই কোথায় মিলিবে, যেখানে জড়দেহ পোষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা নাই, এক মুঠা আহারের জন্য লক্ষ লক্ষ আকৃতি-

ধারীর কোলাহল নাই, যেখানকার ভূমি ও অধিবাসী মাটি ও মাংসে নির্ম্মিত নয়; অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা আমরা যে অবস্থার মধ্যে নিমগ্ন থাকি, সে অবস্থা হইতে আমরা বিরাম চাই। কোথায় যাইব?

পৃথিবী কিছু বিশ্রামের জন্য নহে, পৃথিবীর পদে পদে অভাব। পৃথিবীর উপরে চলিতে গেলে মৃত্তিকার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, পৃথিবীর উপরে বাঁচিতে গেলে শত প্রকার আয়োজন করিতে হয়। যাহার আকার আছে, তাহার বিশ্রাম নাই। আমাদের হৃদয় আকার-আয়তনছাড়া স্থানে বিশ্রামের জন্য যাইতে চায়। বস্তুর রাজ্য হইতে ভাবের রাজ্যে যাইতে চায়। কেবল বস্তু! দিন রাত্রি বস্তু, বস্তু, বস্তু! হৃদয় ভাবের আকাশে গিয়া বলে, "আঃ, বাঁচিলাম আমার বিচরণের স্থান ত এই!"

এমন লোকও আছেন যাঁহারা ভাবিয়া পান না যে, ভাবগত কবিতা বস্তুগত কবিতা অপেক্ষা কেন উচ্চ শ্রেণীর। তাঁহারা বলেন ইহাও ভাল উহাও ভাল। আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা বস্তুগত কবিতা অধিকতর উপভোগ করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরুচিবান্ লোকদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ইন্দ্রিয়-সুখ ভাল, না অতীন্দ্রিয় সুখ ভাল? রূপ ভাল, না গুণ ভাল? ভাবগত কবিতা আর কিছুই নহে, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদয় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।

আমরা সমুদ্র-তীরবাসী লোক। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, সীমা নাই; পদতলে চাহিয়া দেখি, সেই খানেই সীমার আরম্ভ। আমরা যে উপকূলে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাই বস্তু, তাহাই ইন্দ্রিয়। তাহার চতু-

দিকে ভাষার অনধিগম্য সমুদ্র। এ ক্ষুদ্র উপকূলে আমাদের হৃদয়ের বাসস্থান নয়। যখন কাজকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা বেলা এই সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াই, তখন মনে হয় যেন, ওই সমুদ্রের পরপারে কোথায় আমাদের জন্মভূমি,—কে জানে কোথায়? ওই যে, দূর দিগন্তে সূর্য্যের মৃদু রশ্মি-রেখা দেখা যাইতেছে, তাহা যেন আমাদের জন্মভূমির দিক্ হইতে আসিতেছে। সে জন্মভূমির সকল কথা ভুলিয়া গেছি, অথচ তাহার ভাবটা মাত্র মনে আছে—অতি স্বপ্নময়, অতি অস্ফুট ভাব। ইচ্ছা করে ঐ সমুদ্রে সাঁতার দিই, সেই দূর দ্বীপ হইতে বাতাস ধীরে ধীরে আসিয়া আমাদের গাত্র স্পর্শ করে, সেই দূরদিগন্তের অস্ফুট সূর্য্য-কিরণের দিকে আমাদের নেত্র থাকে, আর আমাদের পশ্চাতে এই ধূলিময়, কীটময়, কোলাহলময় উপকূল পড়িয়া থাকে। সাঁতার দিতে দিতে মনে হয় যেন পশ্চাতের উপকূল আর দেখা যাইতেছে না ও সম্মুখে সেই দূর দেশের তট-রেখা যেন এক এক বার দেখা যাইতেছে ও আবার মিলাইয়া যাইতেছে। সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করিয়া আমরা বিশ্রামের জন্য কোথায় আসিব? এই সমুদ্র-কূলেই কি নহে? সমস্ত দিন দোকান বাজারের মধ্যে, রাস্তা গলির মধ্যে থাকিয়া দুই দণ্ড কি মুক্ত বায়ু সেবন করিতে আসিব না? আমরা জানি যে, যেখানে সীমা আরম্ভ সেই খানেই আমাদের কাজকর্ম্ম, যুঝাযুঝি ও অসীমের দিকে আমাদের বিশ্রামের স্থল আছে, সেই দিকেই কি আমরা মাঝে মাঝে নেত্র ফিরাইব না? সে অসীমের দিকে চাহিলে যে অবিমিশ্রিত সুখ হয় তাহা নহে, কোমল বিষাদ মনে আসে। কারণ, সে দিকে চাহিলে আমাদের

ক্ষুদ্রত আমাদের অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে, সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড রহস্যের মধ্যে নিজেকে রহস্য বলিয়া বোধ হয়—সে রহস্য ভেদ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। সমুদ্রে সাঁতার দিতে ইচ্ছা হয়, অথচ তাহা আমাদের সাধ্যের অতীত! অনেক উপকূলবাসী চিরজীবন এই উপকূলের কোলাহলে কাটাইয়াছেন, অথচ এই সমুদ্র-তীরে আসেন নাই, সমুদ্রের বায়ু সেবন করেন নাই। তাঁহাদের হৃদয় কখন স্বাস্থ্য লাভ করে না। হৃদয়কে এই সমুদ্র-তীরে আনয়ন করা, এই সমুদ্রের বক্ষে ভাসমান করা ভাবগত কবিতার কাজ। ভাবগত কবিতায় হৃদয়ের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে মনকে আর এক জগতে লইয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের সহিত সে জগতের সাদৃশ্য থাকুক্ বা না থাকুক সে জগৎ সত্য জগৎ, অলীক জগৎ নহে।

ভাবুক লোক মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন যে, আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার বিষণ্ণ সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ। তাহা আর কিছু নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র। কোন্ কোন্ সময়ে আমাদের হৃদয়ে ঐপ্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্না-রাত্রে, দূর হইতে সঙ্গীতের সুর শুনিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ঘ্রাণে, আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না, সঙ্গীত, বসন্ত-বায়ু, সুগন্ধের ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন আকুল হয় কি কারণে? কেন, সুমিষ্ট দ্রব্য আহার

করিলে বা সুস্নিগ্ধ জলে স্নান করিলে ত আমাদের মন ঐরূপ উদাস ও আকুল হইয়া উঠে না! যখন আহার করি তখন সুস্বাদ ও উদর-পূর্ত্তির সুখ মাত্র অনুভব করি, আর কিছু নয়। কিন্তু জ্যোৎস্না-রাত্রে কেবল মাত্র যে, নয়নের পরিতৃপ্তি হয় তাহা নহে, জ্যোৎস্নায় একটা কি অপরিস্ফুট ভাব মনে আনয়ন করে। যতটুকু সম্মুখে আছে কেবল ততটুকু মাত্রই যে উপভোগ করি তাহা নহে, একটা অবর্ত্তমান রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। তাহার কারণ এই যে, জ্যোৎস্না উপভোগ করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। চারিদিকে জ্যোৎস্না দেখিতেছি অথচ জ্যোৎস্না আমরা পাইতেছি না। ইচ্ছা করে, জ্যোৎস্নাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করি, জ্যোৎস্নাকে আমরা আলিঙ্গন করি, কিন্তু জ্যোৎস্নাকে ধরিবার উপায় নাই। বসন্ত বায়ু হু হু করিয়া বহিয়া যায়। কে জানে কোথা হইতে বহিল! কোন্ অদৃশ্য দেশ হইতে আসিল, কোন্ অদৃশ্য দেশে চলিয়া গেল! আসিল, চলিয়া গেল, বড়ই ভাল লাগিল; কিন্তু তাহাকে দেখিলাম না শুনিলাম না, সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিতেই পারিলাম না। শরীরে যে স্পর্শ হইল, তাহা অতি মৃদুস্পর্শ, কোমল স্পর্শ, কঠিন ঘন স্পর্শ নহে, কাজেই উপভোগে নানা প্রকার অভাব রহিয়া গেল। মধুর সঙ্গীতে মন কাঁদিয়া ওঠে সেই জন্যেই। আবার জ্যোৎস্না রাত্রে সে সঙ্গীত পুষ্পের গন্ধের সঙ্গে, বসন্তের বাতাসের সঙ্গে দূর হইতে আসিলে মন উন্মত্ত করিয়া তুলে। অন্যান্য অনেক ঋতু অপেক্ষা বসন্ত ঋতুতে সকলি অপরিস্ফুট, মৃদু, কিছুই অধিক মাত্রায় নহে;—

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদু মন্দ গতি
বাহির হয়েছে কিবা ঋতুকুল পতি।
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইছে ফুল,
অঙ্গে ঘেরি পরাইছে পল্লব দুকুল।
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হল মলয় বাতাস,
ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে তবু পথ ভুলে,
গন্ধমদে ঢলি পড়ে এ ফুলে ও ফুলে।
মনের আনন্দ আর না পারি রাখিতে,
কোথা হতে ডাকে পিক রসাল শাখিতে,
কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে,
ক্রমে মিলাইয়া যায় কানন গভীরে।

কোথা হইতে বাতাস উদাস হইয়া বাহির হইল, কোথায় সে যাইবে তাহার ঠিক নাই, অতি ভয়ে ভয়ে অতি ধীরে ধীরে তাহার পদক্ষেপ। কোকিল কোথা হইতে সহসা ডাকিয়া উঠিল এবং তাহার স্বর কোথায় যে মিলাইয়া গেল, তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না। এক দিকে উপভোগ করিতেছি আর এক দিকে তৃপ্তি হইতেছে না, কেন না উপভোগ্য সামগ্রী সকল আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নহে। এক দিকে মাত্র সীমা, অন্য দিকে অসীম সমুদ্র। মনে হয়, যদি ঐ সমুদ্র পার হইতে পারি, তবে আমাদের বিশ্রামের রাজ্যে, সুখের রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। যদি জ্যোৎস্নাকে, যদি ফুলের গন্ধকে, যদি সঙ্গীতকে ও বসন্তের বাতাসকে পাই তবে আমাদের সুখের সীমা

থাকে না। এই জন্যই যখন কবিরা জ্যোৎস্না, সঙ্গীত, পুষ্পের গন্ধকে শরীরবদ্ধ করেন, তখন আমাদের এক প্রকার আরাম অনুভব হয়; মনে হয় যেন এইরূপই বটে, যেন এইরূপ হইলেই ভাল হয়!

So young muser, I sat listening
To my Fancy's wildest word—
On a sudden, through the glistening
Leaves around a little stirred,
Came a sound a sense of music,
Which was rather felt than heard.
Softly, finely, it enwound me—
From the world it shut me in—
Like a fountain falling round me
Which with silver water thin
Holds a little marble Naiad
sitting smilingly within.

সঙ্গীত যদি এইরূপ নির্ঝর হইত ও আমরা যদি তাহার মধ্যে বসিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আনন্দই হইত; মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনা করি যেন এইরূপই হইতেছে, এইরূপই হয়!

পৃথিবীতে না কি সকল সুখই প্রায় উপভোগ করিয়াই ফুরাইয়া যায়, ও অবশেষে অসন্তোষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; এই জন্যই যে সুখ আমরা ভাল করিয়া পাই না, যে সুখ আমরা শেষ করিতে পারি না, মনে হয় যেন সেই সুখ যদি পাইতাম, তবেই আমরা সন্তুষ্ট হইতাম। এমন লোক দেখা গিয়াছে, যে দূর হইতে সুকণ্ঠ শুনিয়া প্রেমে পড়িয়া

গিয়াছে। কেননা তাহার মন এই বলে যে, অমন যাহার গলা না জানি তাহাকে কেমন দেখিতে, ও তাহার মনটিও কত কোমল হইবে! ভাল করিয়া দেখিলে পৃথিবীর দ্রব্যে না কি নানা প্রকার অসম্পূর্ণতা দেখা যায়; কাহারো বা গলা ভাল মন ভাল নহে, নাক ভাল চোক ভাল নহে, তাই আমরা বড় বিরক্ত, বড় অসন্তুষ্ট হইয়া আছি; সেই জন্যই দূর হইতে আমরা আধখানা ভাল দেখিলে তাড়াতাড়ি আশা করিয়া বসি বাকিটুকু নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ইহা যদি সত্য হয় তবে দূরেই থাকি না কেন, কল্পনায় পূর্ণতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি না কেন, রক্ত মাংসের অত কাছে ঘেঁসিবার আবশ্যক কি? শরীর ও আয়তন যতই কম দেখি, অশরীরী ভাব যতই কল্পনা করি, বস্তুগত কবিতা যতই কম আহার করি ও ভাবগত কবিতা যতই সেবন করি ততই ত ভাল।

ডি প্রোফণ্ডিস্‌।

টেনিসনের রচিত উক্ত কবিতাটির যথেষ্ট আদর হয় নাই। কোন কোন ইংরাজ সমালোচক ইহাকে টেনিসনের অযোগ্য বলিয়া মনে করেন, অনেক বাঙ্গালী পাঠক ইংরাজ সমালোচকদের ছাড়াইয়া উঠেন। ইংলণ্ডের হাস্যরসাত্মক সাপ্তাহিক পত্র "পঞ্চে" এই কবিতাটিকে বিদ্রূপ করিয়া De-Rotundis নামক একটি পদ্য প্রকাশিত

হয়। আমরা এরূপ বিদ্রূপ কোন মতেই অনুমোদন করি না। এরূপ ভাব ইংরাজদের ভাব। কোন একটি বিখ্যাত মহান্ ভাবের কবিতাকে বিদ্রূপ করা তাঁহারা আমোদের মনে করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন, যে, কোন কবির সম্ভ্রান্ত পূজনীয় কবিতাকে অঙ্গহীন করিয়া রং চং মাখাইয়া ভাঁড় সাজাইয়া, রাস্তায় দাঁড় করাইয়া, দশ জন অলস লঘু-হৃদয় পথিকের দুই পাটি দাঁত বাহির করাইলে সে কবির পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়, ইহাতে ইংরাজ হৃদয়ের এক অংশের শোচনীয় অঙ্গহীনতা প্রকাশ পায়। আমাদের জাতীয় ভাব এরূপ নহে। যদি একজন বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তিকে অপদস্থ করিবার জন্য সভা মধ্যে কেহ তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিয়া মুখভঙ্গী করিতে থাকে, তবে তাহাকে দেখিয়া রসিক পুরুষ মনে করিয়া যাহারা হাসে, তাহাদের ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

টেনিসনের De Profundis কবিতাটি যে সমাদৃত হয় নাই, তাহার একটা কারণ, বিষয়টি অত্যন্ত গভীর গুরুতর। আর একটা কারণ, ইহাতে এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহা সাধারণতঃ ইংরাজেরা বুঝিতে পারেন না, আমরাই সে সকল ভাব যথার্থ বুঝিবার উপযুক্ত। ইংরাজীবাগীশ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের অনেকে ইংরাজী কাব্য দিশী ভাবে সমালোচনা করিতে ভয় পান। তাঁহারা বলেন, যদি ইংরাজ সমালোচকদের উক্তির সহিত দৈবাৎ অমিল হইয়া যায়! না হয়, তাহা হইল। ইংরাজ সমালোচকের কথা ইংরাজী হিসাবে যেরূপ সত্য, আমাদের দেশীয় সমালোচকের কথা আমাদের দেশী-

হিসাবে তেমনি সত্য। উভয়ই বিভিন্ন অথচ উভয়ই সত্য হইতে পারে। গোলাপ ফুল যদি তাহার প্রতিবেশী পাতাকে সূর্য্যকিরণে সবুজ হইতে দেখিয়া মনে করে, সূর্য্যকিরণে আমারও সবুজ হওয়া উচিত ও সবুজ হইয়া উঠাই যদি তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ফুল-মণ্ডলী তাহাকে পাগল বলিয়া আশঙ্কা করে।

De Profundis কবিতাটি কবির সন্তানের জন্মোপলক্ষে লিখিত। সন্তানের জন্মোপলক্ষে লিখিত কবিতা সাধারণতঃ লোকে যে ভাবে পড়িতে যায়, এই কবিতায় সহসা তাহাতে বাধা পায়। কচি মুখ, মিষ্টহাসি, আধ-আধ-কথা ইহার বিষয় নহে। একটি ক্ষুদ্রকায়া সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে মিষ্ট ভাব, কচিভাব ব্যতীত আরেকটি ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সকলের চোখে পড়ে না কিন্তু তাহা ভাবুক কবির চক্ষে পড়ে। সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে একটি অপরিসীম মহান্ ভাব, অপরিমেয় রহস্য আবদ্ধ আছে, টেনিস্‌ন্ তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণ পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না অথবা এই অচেনা ভাব হৃদয়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না।

Tennyson এই কবিতাটিকে "The Two Greetings" কহিয়াছেন। অর্থাৎ, ইহাতে তাঁহার সন্তানটিকে দুই ভাবে তিনি সম্ভাষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহার নিজের সন্তান বলিয়া; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার আপনাকে তফাৎ করিয়া। এক, তাহার মর্ত্ত্য জীবন ধরিয়া আর এক তাহার অস্তিত্ব ধরিয়া। একটিতে, তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিয়া, আর একটিতে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে দেখিয়া। তাঁহার সন্তানের মধ্যে তিনি দুইটি ভাগ দেখিতে পাইয়াছেন;

একটি ভাগকে তিনি স্নেহ করেন, আর একটী ভাগকে তিনি ভক্তি করেন। প্রথম সম্ভাষণ স্নেহের সম্ভাষণ, দ্বিতীয় সম্ভাষণ ভক্তির। তাঁহার কবিতার এই উভয় ভাগেই কবি অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন; এক দিগন্ত হইতে আর এক দিগন্তে দৃষ্টি-পাত করিয়াছেন।

প্রথম ভাগ। প্রথম, শিশু জন্মাইতেই তিনি ভাবিলেন, এ কোথা হইতে আসিল? বৈদিক ঋষি-কবিরা মহা অন্ধকারের রাজ্য হইতে দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্র-গর্ভ হইতে তরুণ সূর্য্যকে উঠিতে দেখিয়া যেমন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেন, এ কোথা হইতে আসিল, তেমনি সসম্ভ্রমে কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কোথা হইতে আসিল? তিনি বর্ত্তমান দেশকালের বন্ধন সীমা অতিক্রম করিয়া, কত দূরে, কত উচ্চে অতীতের মহা গঙ্গোত্রী-শিখরের দিকে ধাবমান হইলেন। কবির বিচরণের স্থান এমন আর কোথায়? তিনি দেখিলেন, এই শিশুটি যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই পৃথিবীরই সহোদর। মহা সৌরজগতের যমজ ভ্রাতা। তিনি তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "বৎস আমার, মহা-সমুদ্র হইতে, যেখানে যাহা-কিছু-ছিল-র মধ্যে যাহা-কিছু-হইবে (অর্থাৎ অতীতের মধ্যে ভবিষ্যৎ, অপরিস্ফুট-তার মধ্যে পরিস্ফুটতা) কোটি কোটি যুগ যুগান্তর ধরিয়া অগণ্য আবর্ত্তমান জ্যোতিঃপুঞ্জের মহা-মরুর মধ্যে ঘূর্ণ্যমান হইতেছিল, তুমি সেইখান হইতে আসিতেছ। সেইখান হইতেই সূর্য্য আসিয়াছে, পৃথিবী ও চন্দ্র আসিয়াছে, এবং তাহার অন্যান্য গ্রহ সহোদরগণ আসিয়াছে।" অতীতের সেই উষা-গর্ভে কবি প্রবেশ করি-

য়াছেন দেখিলেন অপরিস্ফুট পৃথিবীর কারণপুঞ্জ যেখানে আবর্ত্তিত হইতেছে, আজিকার সদ্যোজাত শিশুটির কারণপুঞ্জ সেইখানে ঘুরিতেছে। উভয়ের বয়স এক; কেবল একজন ত্বরায় আমাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে, আর একজন প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিয়াছে।

"Out of the deep, my child, out of the deep,
Where all that was to be, in all that was,
Whirl'd for a million aeons thro the vast
Waste dawn of multitudinous eddying light—
Out of the deep, my child, out of the deep,
Thro' all this changing world of changeless law,
And every phase of every-heightening life,
And nine long months of antenatal gloom,
With this last moon, this crescent—her dark orb
Touched with earth's light—thou comest, darling boy;"

অতীতের কথা শেষ হইয়াছে, এখন বর্ত্তমানের কথা আসিতেছে। কবি শিশুটির পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, অতীত কাল যাহাকে এত যত্নে লালন পালন করিয়া আসিয়াছে, সে কে? সে তাঁহারই প্রাণাধিক পুত্র। তাঁহারই পুত্রকে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারার সঙ্গে অতীত মাতা এক গর্ভে ধারণ করিয়াছে, এক জ্যোতির্ম্ময় দোলায় দোলাইয়াছে, এক স্তন পান করাইয়া পুষ্ট করিয়াছে, আজ তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিল। তাঁহার আজিকার এই প্রাণাধিক বৎস প্রকৃতির এত দিনকার যত্নের ধন। তাহাকে কহি-

লেন "তুই আমাদের আপনার ধন। তোর সর্ব্বাংশসুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গঠন ভাবী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বয়স্ক পুরুষের ভবিষ্যৎসূচনা করি-তেছে। আমার স্ত্রীর ও আমার মুখ ও গঠন তোর মুখের ও গঠনের মধ্যে অছেদ্য-বন্ধনে বিবাহিত হইয়াছে।" কবি দেখিলেন, সে নিতান্তই তাঁহাদের। তাহার শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহাদের উভয়ের হইতে গঠিত হইয়াছে। অবশেষে তাহার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ও কহিলেন ;—

Live and be happy in thyself, and serve
This mortal race thy kin so well, that man
May bless thee as we bless thee O young life,
Breaking with laughter from the dark ; and may
The fated channel where thy motion lives
Be prosperously shaped, and sway thy cousre
Along the years of haste and random youth
Unshattered ; then full current thro' full man ;
And last in kindly curves with gentlest fall,
By quiet fields, a slowly dying power,
To that last deep where we and thou are still."

এখন আর সে নিতান্তই তাঁহাদের নহে। এখন তাহার নিজত্ব বিকশিত হইয়াছে। এখন তাহার নিজের কাজ আছে। কবি তাহার মর্ত্ত্য জীবনের তিনটি অবস্থা সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমে মর্ত্ত্য জীবনের আদি কারণ আলোচনা করিলেন, পরে তাহার জন্ম অর্থাৎ মনুষ্য শরীর ধারণ আলোচনা করিলেন ও পরে তাহার পার্থিব জীবন

আলোচনা করিলেন। এই খানেই সমস্ত ফুরাইল। প্রথম সম্ভাষণ শেষ হইল। এই সম্ভাষণে কবি একটি মর্ত্ত্যের মনুষ্যকে সম্ভাষণ করিয়াছেন। যতক্ষণ সে মনুষ্য, ততক্ষণ সে তাঁহার। তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্যই অতীত ইহাকে গড়িয়াছে। গঠিত অবস্থায় দেখিলেন সে তাঁহারই মত। ইহাতে কেবল শরীর ও জীবনের কথাই আছে। "তুমি বাঁচিয়া থাক, তুমি কাজ কর, তোমার জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক্, ও অবশেষে যথা সময়ে অতি ধীর-ক্রমে তাহার অবসান হউক্।" ইহাই কবির সমস্ত সম্ভাষণের মর্ম্ম। কবি তাঁহার সন্তানের মর্ত্ত্য অংশকে সম্ভাষণ করিতেছেন, সুতরাং উপরি-উক্ত আশীর্ব্বচন মর্ত্ত্য জীবনের প্রতি সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যাহা হউক্, এইখানেই সমস্ত শেষ হইয়া যায়, জীবন আরম্ভ হইল জীবন শেষও হইল। তখন জীবনের সমাধি-স্তম্ভের উপর কবি দাঁড়াইয়া দূর দূরান্তরে দৃষ্টি চালনা করিলেন, দেখিলেন, জীবন শেষ হইল, তাঁহার সন্তান শেষ হইল, কিন্তু যে সূত্র বাহিয়া এই সন্তান আসিয়াছে, সেই সূত্রের শেষ হইল না। তিনি এখন দেখিলেন, অনন্ত পথের একজন পথিক, পথের মধ্যে অবস্থিত তাঁহার গৃহে, পৃথিবীতলে অতিথি হইয়াছে। এই আতিথ্য-জীবনকে সন্তান বলে, মনুষ্য বলে। আতিথ্য-জীবন ফুরায়, সন্তানও ফুরায়, মনুষ্যও ফুরায় কিন্তু পথিক ফুরায় না। প্রথমে তিনি সেই অতিথিকে সম্ভাষণ করিলেন, এখন সেই মহা-পান্থকে সম্ভাষণ করিতেছেন। এখন পৃথিবীর অতিথিকে নহে, মহাকালের অতিথিকে সম্ভাষণ করিলেন। এখন তিনি দেখিতেছেন যে, এই পথিক সৌর জগতেরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

প্রথম সম্ভাষণে তিনি কোটি কোটি যুগ ও আবর্ত্তমান আলোকের নির্ম্মাণ-শালার উল্লেখ করিয়াছেন, অপরিবর্ত্তনীয় পরিবর্ত্তনের জগতে ক্রমোত্থানশীল জীবনের উল্লেখ করিয়াছেন—এবং কহিয়াছেন—

With this last moon, this crescent,—her dark orb
Touched with earth's light—thou comest,"

অর্থাৎ মনুষ্যের জন্মও এইরূপ চন্দ্রকলার ন্যায়; তাহার একাংশ পৃথিবীর জীবন, পৃথিবীর বুদ্ধি পাইয়া আলোকিত হয়। দ্বিতীয় ভাগে যাহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন, তাহার কারণ আলোচনা করিতে গিয়া কবি সময়ের সংখ্যা গণনা করেন নাই, নির্ম্মাণের উপাদান উল্লেখ করেন নাই। এইবার তিনি কহিতেছেন—

Out of the deep, my child, out of the deep,
From that great deep, before our world begins,
Wherein the Spirit of God moves as he will—
Out of the deep, my child, out of the deep,
From that true world within the world we see,
Whereof our world is but the bounding shore—
Out of the deep, my child, out of the deep,
With this ninth moon, that sends the hidden sun
Down yon dark sea, thou comest darling boy.

এবার কবি যে সমুদ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আলোকের সমুদ্র নহে, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের দিকে তাহার উপকূল নাই, তাহা তিন কাল মগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছে। জগতের আত্মাকে তিনি উল্লেখ করিতেছেন। জগতের অন্তরস্থিত যথার্থ জগতের কথা

বলিতেছেন। বাহ্য জগত সেই অন্তর্জগতকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

"Out of the deep, spirit, out of the deep.
With this ninth moon, that sends the hidden sun
Down yon dark sea, thou comest, darling boy.

সেই সমুদ্র হইতে তুমি আসিতেছ। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে সমুদ্রতলে বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষীণালোকে চন্দ্র উদিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উদিত হইলে, তুমিও মহা-জ্যোতিকে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলে। পূর্ব্বে যে মনুষ্যকে কবি সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সে অপরিস্ফুটতর অবস্থা হইতে পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবারে যে আত্মাকে সম্ভাষণ করিতেছেন সে পূর্ণ অবস্থা হইতে অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

For in the world which is not ours, They said
'Let us make man' and that which should be man,
From that one light no man can look upon,
Drew to this shore lit by suns and moons
And all the shadows.'.

কি মহা রহস্য-পূর্ণ উক্তি! কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, কিছুরই সীমা পাইতেছি না। "সে জগৎ আমাদের নহে।" সে কোন্ জগৎ? কে জানে কোন্ জগৎ। মহাকবি আদি কবির মনো-জগৎ কি? "They said" তাহারা কহিল। কাহারা? কে জানে কাহারা! তাঁহার মনোরাজ্যের অধিবাসীরা? তাঁহার ভাবসমূহ, তাঁহার কল্পনা? এখানে সমস্তই রহস্য। কবি আলোকের রাজ্যে

অন্ধ হইয়া দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। এই নিমিত্ত তাঁহার কথা অস্পষ্ট অথচ মহান্ ভাবপূর্ণ। আমরা কল্পনায় দেখিতে পাইতেছি একটি মর্ত্ত্যের শিশু বর্ণনার অতীত মহাজ্যোতির্ম্ময় অনন্ত রাজ্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে, কোথায় কি, ঠাহর পাইতেছে না, চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে, মন অভিভূত হইয়া গিয়াছে, মুখে কথা ফুটিতেছে না। তিনি কহিতেছেন। "যে জগৎ আমাদের নহে, সেই জগতে তাহারা কহিল—আইস, আমরা মনুষ্য হই।"—ভাবী মনুষ্য, মনুষ্য চক্ষুর অসহনীয় সেই এক-আলোক হইতে এই ছায়া-লোকিত উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল।" One light এক পরম-জ্যোতি হইতে তাহারা আসিতেছে। সেই জ্যোতির তাহারা অংশ। খৃষ্টান্ সমালোচকগণ এ সকল ভাব বুঝিবে কি রূপে?

O dear spirit half lost
In thine own shadow and this fleshly sign
That thou art thou—who wailest being born
And banished into mystery, and the pain
Of this divisible indivisible world,
Among the numerable innumerable
Sun, sun, and sun, thro' finite infinite space
In finite infinite Time—our mortal veil
And shattered phantom of that infinite one,
Who made thee unconceivably Thyself
Out of this World-self and all in all—
Live thou;

হে আত্মা, তুমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছ? তুমি কি হইতে

কি হইয়াছ! তুমি যে জগতে আসিয়াছ, তাহাকে ভাগ করিয়া শেষ করা যায়। তখন যে এক-জগতে ছিলে, তাহা গণনার জগৎ নহে। এখন যে জগতে আসিয়াছ, এখানে সূর্য্য নক্ষত্র গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, তথাপি গণনা করা যায়। তখন অসীম দেশে অসীম কালে ছিলে, এখন যে দেশে যে কালে নির্ব্বাসিত হইয়াছ তাহার সীমা পাইতেছি না অথচ সীমা আছে। তাহা সীমা-বিভক্ত অসীম।

তুমি কি ছিলে কি হইয়াছ! তুমি ছিলে এক অসীমের মধ্যে, এখন তুমি তাঁহার চূর্ণ বিচূর্ণ উপচ্ছায়া মাত্র। কিন্তু এই খানেই তোমার শেষ নহে। তুমি অসীমের নিকট হইতে অসীম দূরে আসিয়াছ; তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। তোমাকে আর কি কহিব!—

"Live thou; and of the grain and husk, the grape
And ivyberry, choose; and still depart
From death to death thro' life and life find
Nearer and ever nearer Him who wrought
Not matter, nor the finite infinite,
But this main miracle that thou art thou,
With power on thine own act and on the world."

প্রথম সম্ভাষণে মনুষ্য-ভাবে তোমাকে কহিয়াছিলাম।

"Live, and be happy in thyself, and serve
This mortal race thy kin."

বাঁচিয়া থাক, তুমি সুখী হও, তোমার স্বজাতীয় জীবদিগকে সুখী কর ও অবশেষে বিনা কষ্টে ধীরে ধীরে মৃত্যু লাভ কর। মানুষের পক্ষে

ইহা অপেক্ষা আর কি আশীর্ব্বাদ আছে! কিন্তু দ্বিতীয় সম্ভাষণে তোমাকে কহিতেছি—"বাঁচিয়া থাক।" এখানে বাঁচিয়া থাকার অর্থে মর্ত্ত্য জীবন নহে, অনন্ত চেতনা। জন্মে জন্মে যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ কর, যাহা মন্দ তাহাই পরিত্যাগ কর। ও পদে পদে মৃত্যুর দ্বার সমূহ অতিক্রম করিয়া অমৃতের দিকে ধাবমান হও। দুইটী সম্ভাষণে দুই প্রকারের বিভিন্ন আশীর্ব্বাদ কেন করিলাম? না প্রথম বারে আমি বস্তু (matter) ও সসীম-অসীমকে সম্বোধন করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বারে আমি তোকে সম্ভাষণ করিতেছি Who art "not matter, nor the finite infinite, but this main-miracle, that thou art thou, with power on thine own act and on the world."

সন্তানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কবি কি এক অনন্ত রাজ্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! এই অনন্ত মন্দিরে গিয়া তিনি কাহাকে দেখিতে পাইলেন? কি গান গাইয়া উঠিলেন? বৈদিক ঋষিরা যে গান গাইয়াছেন।

Hallowed be Thy name—Halleluiah—
Infinite Ideality!
Immeasurable Reality:
Infinite Personality;
Hallowed be thy name—Halleluiah;
We feel we are nothing—for all is thou and in Thee
We feel we are some thing—that also has come from thee;
We know we are nothing—but thou wilt help us to be.
Hallowed be thy name—Halleluiah:

অনন্ত ভাব। অপরিমেয় সত্য। অপরিসীম পুরুষ। অনন্ত ভাব আমাদের হইতে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী। কিছুতেই তাহার কাছে যাইতে পারি না। অবশেষে সেই ভাব মাত্রকে যখন সত্য বলিয়া জানিলাম, তখন তিনি আমাদের আরো কাছে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবলমাত্র সত্য বলিয়া জানিয়া তৃপ্তি হয় না। কেবল মাত্র একটি অন্ধ কারণ, অন্ধ শক্তি, অন্ধ সত্য বলিয়া জানিলে সম্পূর্ণ জানা হয় না। যখন জানিলাম তিনি অসীম পুরুষ, তাঁহার নিজত্ব আছে, তখন তিনি আমাদের কাছে আসিলেন, তখন তাঁহাকে আমরা প্রীতি করিতে পারিলাম। তখন তাঁহাকে কহিলাম তোমার জয় হউক!

"We feel we are nothing—for all is Thou and in thee" ইহা অতীতের কথা। যখন আমরা তোমার মধ্যে ছিলাম তখন আমরা অনুভব করিতাম না যে আমরা কিছু, সকলি তুমি। ইহাই আমাদের ভাব মাত্র। তোমার মধ্যে আমরা ভাব মাত্রে ছিলাম। অবশেষে তোমার কাছ হইতে যখন আসিলাম, তখন অনুভব করিতে লাগিলাম, আমরা কিছু we feel we are something—that also has come from thee ইহা বর্ত্তমানের কথা, ইহাই আমাদের সত্য। এখন আমরা কিছু হইয়াছি, আমরা সত্য হইয়াছি, "We know we are nothing—but Thou wilt help us to be." ইহা ভবিষ্যতের কথা। আমরা জানি আমরা কিছুই নই—তুমি আমাদের ক্রমশই গঠিত করিয়া তুলিতেছ, আমাদের ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছ। মৃত্যুর মধ্য দিয়া নূতন নূতন সত্য, নূতন নূতন জ্ঞান শিখাইয়া আমাদের পূর্ণ ব্যক্তি করিয়া তুলিতেছ। কোনও কালেই তাহা হইতে পারিব

না, চিরকালই "Thou wilt help us to be" অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার আনন্দ আমরা চিরকাল ভোগ করিব। তোমার জয় হউক। মর্ত্ত্যজীবনেও এই ক্রমোন্নতির তুলনা মিলে। মনুষ্য প্রথমে এক মহা বাষ্প রাশির মধ্যে, সমস্ত জগতের আদিভূতের মধ্যে মিলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পৃথক্ হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিল। অবশেষে যতই সে বড় হইতে লাগিল, অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব জন্মিতে লাগিল। এই ক্রম অনুসারেই কবি ঈশ্বরকে প্রথমে অনন্ত ভাব, পরে অপরিমেয় সত্য ও তৎপরে অপরিসীম পুরুষ বলিয়াছেন। এইখানে কবিতা শেষ হইল। ইহার পরে আর কোথায় যাইবে? ইহাই চূড়ান্ত সীমা! যাঁহারা একটা দৈত্যকে পর্ব্বত বলিলে, দৈত্যের যষ্টিকে শালবৃক্ষ কহিলে মহানুভাবে হাঁ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে, এত বড় কবিতার মহান্ ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না ইহাই আশ্চর্য্য। বস্তুগত মহানুভাব পর্য্যন্তই বোধ করি তাঁহাদের কল্পনার সীমা, বস্তুর অতীত মহান্ ভাব তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন না। তাহা যদি পারিতেন, তবে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কবিতাটিকে সমস্ত Paradise lost-এর অপেক্ষা মহান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন।

য়ুরোপের সাহিত্যে মহাকাব্য লিখিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। কোন কবি মহাকাব্য লিখেন না, অনেক পাঠক মহাকাব্য পড়েন না, অনেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া পড়েন, অনেকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পড়েন। অনেক সমালোচক দুঃখ করিতেছেন, এখন আর মহাকাব্য লিখা হয় না, কবিত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, সভ্যতার পাড়ে যতই চর পড়িবে, কবিত্বের পাড়ে ততই ভাঙ্গন ধরিবে! প্রমাণ কি? না, সভ্যতার অপরিণত অবস্থায় মহাকাব্য লেখা হইয়াছে, এখন আর মহাকাব্য লেখা হয় না।. তাঁহাদের মতে, বোধ করি, এমন সময় আসিবে, যখন কোন কাব্যই লেখা হইবে না।

সভ্যতার সমস্ত অঙ্গে যেরূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, কবিতার অঙ্গেও যে সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কবিতা সভ্যতা-ছাড়া একটা আকাশ-কুসুম নহে। কবিতা নিতান্তই আসমানদার নয়। তাহার সমস্ত ঘর বাড়িই আস্‌মানে নহে। তাহার জমিদারীও যথেষ্ট আছে।

সভ্যতার একটা লক্ষণ এই যে, দেশের সভ্য অবস্থায় এক জন ব্যক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা হয় না। দেশ বলিলেই একজন বা দুই জন বুঝায় না, শাসনতন্ত্র বলিলে এক জন বা দুই জন বুঝায় না। ব্যক্তি নামিয়া আসিতেছে ও মণ্ডলী বিস্তৃত হইতেছে। এখন এক জন ব্যক্তিই

লক্ষলোকের সমষ্টি নহে। এখন শাসনতন্ত্র আলোচনা করিতে হইলে একটি রাজার খেয়াল, শিক্ষা ও মনোভাব আলোচনা করিলে চলিবে না; এখন অনেকটা দেখিতে হইবে, অনেককে দেখিতে হইবে। এখন যদি তুমি একটা যন্ত্রের একটা অংশ মাত্র দেখিয়া বল যে, এ ত খুব অল্প কাজই করিতেছে, তাহা হইলে তুমি ভ্রমে পড়িবে। সে যন্ত্রের সকল অঙ্গই পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

এখনকার সভ্যসমাজে দশটাকে মনে মনে তেরিজ কষিয়া এক-টাতে পরিণত কর। কবিতাও সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। সভ্য দেশের কবিতা এখন যদি তুমি আলোচনা করিতে চাও, তবে একটা কাব্য, একটি কবির দিকে চাহিও না। যদি চাও ত বলিবে "এ কি হইল! এ ত যথেষ্ট হইল না! এদেশে কি তবে এই কবিতা?" বিরক্ত হইয়া হয়ত প্রাচীন সাহিত্য অন্বেষণ করিতে যাইবে। যদি মহাভারত, কি রামায়ণ, কি গ্রিসীয় একটা কোন মহাকাব্য নজরে পড়ে, তবে বলিবে "পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, প্রচুর হইয়াছে!" এক মহা-ভারত বা এক রামায়ণ পড়িলেই তুমি প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত ভাবটি পাইলে। কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে। এখন একখানা কবিতার বইকে আলাদা করিয়া পড়িলে পাঠের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। মনে কর ইংলণ্ড। ইংলণ্ডে যত কবি আছে সকলকে মিলাইয়া লইয়া এক বলিয়া ধরিতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কবিতা-পাঠক-শ্রেণী আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে এক একটা মহাকাব্য রচিত হইতেছে। তাঁহারা বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কাব্য গুলি মনের মধ্যে একত্রে বাঁধাইয়া রাখিতেছেন। ইংলণ্ডের সাহিত্যে মানব-হৃদয় নামক একটা বিশাল মহাকাব্য রচিত

হইতেছে, অনেক দিন হইতে অনেক কবি তাহার একটু একটু করিয়া লিখিয়া আসিতেছেন। পাঠকেরাই এই মহাকাব্যের বেদব্যাস। তাঁহারা মনের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশ করিয়া তাহাকে একত্রে পরিণত করিতেছেন। যে কেহ ইহার একটি মাত্র অংশ দেখেন অথবা সকল অংশ গুলিকে আলাদা করিয়া দেখেন, তিনি নিতান্ত ভ্রমে পড়েন। তিনি বলেন, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য অগ্রসর হইতেছে না। তিনি কি করেন? না, একটি সাধারণ তন্ত্রের শাসন-প্রণালীর প্রতিনিধিগণের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া দেখেন। দেখেন রাজার মত প্রভূত ক্ষমতা কাহারো হস্তে নাই, রাজার মত একাধিপত্য কেহ করিতে পায় না ও তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, "দেশের রাজ্য প্রণালী ক্রমশই অবনত হইয়া আসিতেছে। সভ্যতা বাড়িতেছে বটে কিন্তু রাজ্যতন্ত্রের উন্নতি কিছুই দেখিতে পাই-তেছি না। বরঞ্চ উল্টা!" কিন্তু সভ্যতা বাড়িতেছে বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞানও বাড়িতেছে কবিতাও বাড়িতেছে।

রাজ্যতন্ত্র যখন খুব জটিল ও বিস্তৃত হয়, তখন সাধারণতন্ত্রের বিশেষ আবশ্যকতা বাড়ে। যতদিন ছোটখাট সোজাসুজি রকম থাকে, ততদিন সাধারণতন্ত্রের ন্যায় অতবড় বিস্তৃত রাজ্য-প্রণালীর তেমন আবশ্যকতা থাকে না। এক রাজায় আর যখন চলে না, তখন সে রাজার দিন ফুরায়। য়ুরোপে তাহাই হইয়া আসিয়াছে। (কবিতার রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তম অনুভাব হইতে অতি সূক্ষ্মতম অনুভাব, জটিলতম অনুভাব হইতে অতি বিশদতম অনুভাব সকল কবিতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনকার কবিতায় এমন

সকল ছায়া-শরীরী মৃদুস্পর্শ কল্পনা খেলায়, যাহা পুরাতন লোকদের মনেই আসিত না ও সাধারণ লোকেরা ধরিতে ছুঁইতে পারে না, এমন সকল গূঢ়তম তত্ত্ব কবিতায় নিহিত থাকে যাহা সাধারণতঃ সকলে কবিতার অতীত বলিয়া মনে করে। প্রাচীনকালে কবিতায় কেবল নলিনী মালতী মল্লিকা যুঁথি জাতি প্রভৃতি কতকগুলি বাগানের ফুল ফুটিত, আর কোন ফুলকে যেন কেহ কবিতার উপযুক্ত বলিয়াই মনে করিত না, আজ কাল কবিতায় অতি ক্ষুদ্র-কায়া, সাধারণতঃ চক্ষুর অগোচর, তৃণের মধ্যে প্রস্ফুটিত সামান্য বন ফুলটি পর্য্যন্ত ফুটে। এক কথায়—যাহাকে লোকে, অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়াই হউক্ বা চক্ষুর দোষেই হউক, অতি সামান্য বলিয়া দেখে, বা একেবারে দেখেই না, এখনকার কবিতা তাহার অতি বৃহৎ গূঢ়ভাব খুলিয়া দেখায়। আবার যাহাকে অতি বৃহৎ, অতি অনায়ত্ত বলিয়া লোকে ছুঁইতে ভয় করে, এখনকার কবিতায় তাহাকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দেয়। অতএব এখনকার উপযোগী মহাকাব্য একজনে লিখিতে পারে না, একজনে লিখেও না।

এখন শ্রম-বিভাগের কাল। সভ্যতার প্রধান ভিত্তিভূমি শ্রম-বিভাগ। কবিতাতেও শ্রম-বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রম-বিভাগের আবশ্যক হইয়াছে।

পূর্ব্বে একজন পণ্ডিত না জানিতেন এমন বিষয় ছিল না। লোকেরা যে বিষয়েই প্রশ্ন উত্থাপন করিত, তাঁহাকে সেই বিষয়েই উত্তর দিতে হইত, নহিলে আর তিনি পণ্ডিত কিসের? এক অরিষ্টটল দর্শনও লিখিয়াছেন, রাজ্য-নীতিও লিখিয়াছেন, আবার ডাক্তারিও লিখিয়াছেন। তখনকার সমস্ত বিদ্যাগুলি হ-য-ব-র-ল হইয়া একত্রে ঘেঁসাঘেঁষি

করিয়া থাকিত। বিদ্যাগুলি একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিত, এক একটা করিয়া পণ্ডিত তাহাদের কর্ত্তা। পরস্পরের মধ্যে চরিত্রের সহস্র প্রভেদ থাক্, এক অন্ন খাইয়া তাহারা সকলে পুষ্ট। এখন ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, সকলেরই নিজের নিজের পরিবার হইয়াছে; একত্রে থাকিবার স্থান নাই; একত্রে থাকিলে সুবিধা হয় না ও বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তি সকল একত্রে থাকিলে পরস্পরের হানি হয়। কেহ যেন ইহাদের মধ্যে একটা মাত্র পরিবারকে দেখিয়া বিদ্যার বংশ কমিয়াছে বলিয়া না মনে করেন। বিদ্যার বংশ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, একটা মাথায় তাহাদের বাসস্থান কুলাইয়া উঠে না। আগে যাহারা ছোট ছিল, এখন তাহারা বড় হইয়াছে। আগে যাহারা একা ছিল, এখন তাহাদের সন্তানাদি হইয়াছে।

যখন জটিল, লীলাময়, গাঢ়, বিচিত্র, বেগবান মনোবৃত্তি সকল সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত, ঘটনা-বৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন আর মহাকাব্যে পোষায় না। তখনকার উপযোগী মহাকাব্য লিখিয়া উঠাও এক জনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়। গীতিকাব্য মহাকাব্যের পূর্ব্বেও ছিল কি না সে পরে আলোচিত হইবে। এক মহাকাব্যের মধ্যে সংক্ষেপে, অপরিস্ফুট ভাবে অনেক গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য থাকে, অনেক কবি সেই গুলিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শকুন্তলা, উত্তর-রাম-চরিত প্রভৃতি তাহার উদাহরণ স্থল। গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য যখন এতদূর বিস্তৃত হইয়া উঠে, যে, মহাকাব্যের অল্পায়তন স্থানে তাহারা ভাল স্ফূর্ত্তি পায় না, তখন তাহারা পৃথক্

হইয়া পড়ে। অতএব ইহাতে কবিতার অশুভ আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই।

প্রথমে সৌরজগৎ একটি বাষ্পচক্র ছিল মাত্র, পরে তাহা হইতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল সৃজিত হইল। এখনকার মতন তখন বৈচিত্র্য ছিল না। আমাদের এই বিচিত্রতাময় খণ্ড ও গীতিকাব্য সমূহের বীজ মাত্র সেই সৌর মহাকাব্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের মত বসন্ত বর্ষা ছিল না; কানন, পর্ব্বত, সমুদ্র ছিল না; পশু পক্ষী পতঙ্গ ছিল না; সকলেরই মূল কারণ মাত্র ছিল। এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া সৌর জগৎ পরিপূর্ণতর হইয়াছে। ইহার কোন অংশ সেই মহা সৌর-চক্রের সমান নহে বলিয়া কেহ যেন না বলেন যে জগৎ ক্রমশই অসম্পূর্ণতর হইয়া আসিয়াছে। এখন সৌর জগতের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে এই বিচ্ছিন্ন,অথচ আকর্ষণ সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্য-তন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে; তাহা হইলে আর কাহারো সন্দেহ থাকিবে না যে, এখনকার সৌরজগৎ পরিস্ফুটতর উন্নততর। জগতেরও উন্নতি পর্য্যায়ের মধ্যে শ্রম-বিভাগ আছে। সৌরজগতের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, পৃথক পৃথক হইয়া কাজের ভাগ না করিলে কোন মতেই চলে না। যদি আধুনিক বিজ্ঞান রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়াও কিয়দ্দূর যাওয়া যায়, যদি এই একত্র-সম্মিলিত বাষ্পরাশি-গত অবস্থার পূর্ব্বেও আর কোন অবস্থা থাকে এমন অনুমান করা যায়, তবে তাহা নানা স্বতন্ত্র আদিভূত সমূহের অস্ফুট ভাবে পৃথক ভাবে বিশৃঙ্খল সঞ্চরণ, পরস্পর সংঘর্ষ। যাহাকে ইংরাজিতে chaos বলিয়া থাকে। প্রথমে বিশৃঙ্খল পার্থক্য, পরে একত্র সম্মিলন, ও তাহার পরে

শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচ্ছেদ। আমাদের বুদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথমে কতকগুলা বিশৃঙ্খল পৃথক সত্য, পরে তাহাদের এক শ্রেণী বদ্ধ করা, ও তৎপরে তাহাদের পরিস্ফুট বিভাগ। সমাজেও এই নিয়ম। প্রথমে বিশৃঙ্খল পৃথক পৃথক ব্যক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রীকরণ, তাহার পরে প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সুশৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্য, সুসংযত স্বাধীনতা; কবিতাতেও এ নিয়ম খাটে। প্রথমে ছাড়া ছাড়া বিশৃঙ্খল অস্ফুট গীতোচ্ছ্বাস, পরে পুঞ্জীভূত মহাকাব্য, তাহার পরে বিচ্ছিন্ন পরিস্ফুট গীত সমূহ। সৌর জগতের কবিতাকে যে ভাবে দেখা আবশ্যক, উন্নততর সাহিত্যের কবিতাকেও সেই ভাবে দেখা কর্ত্তব্য। নহিলে ভ্রমে পড়িতে হয়।

সভ্যতার জোয়ারের মুখে সমস্ত সমাজ তীরের মত অগ্রসর হইতেছে, কেবল কবিতাই যে, উজান বাহিয়া উঠিতেছে এমন কেহ না মনে করেন। এখন বিশেষ ব্যক্তির (individual) গুরুত্ব লোপ পাইতেছে বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, সংসার খাট হইয়া আসিতেছে। কারণ Tenneyson বলিতেছেন—

"The individual withers and the world is more and more."

একদল পণ্ডিত বলেন যে যতদিন অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব থাকে ততদিন কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব সভ্যতার দিবসালোকে কবিতা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা, তাহাই মানিলাম। মনে কর কবিতা নিশাচর পক্ষী। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা

কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানের আলো আর কি করেন, কেবল "makes the darkness visible". বিজ্ঞান প্রত্যহ অন্ধকার আবিষ্কার করিতেছেন। অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস্ সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে! সে রহস্য-প্রিয় কিন্তু এত রহস্য কি আর কোন কালে ছিল! এখন একটা রহস্যের আবরণ খুলিতে গিয়া দশটা রহস্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। বিধাতা রহস্য দিয়া রহস্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। একটা রহস্যের রক্তবীজকে হত্যা করিতে গিয়া তাহার লক্ষ লক্ষ রক্ত বিন্দুতে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ জন্মিতেছে। মহাদেব রহস্য-রাক্ষসকে এইরূপ বর দিয়া রাখিয়াছেন, সে তাঁহার বরে অমর।

যেমন, এমন ঘোরতর অজ্ঞ কেহ কেহ আছে, যে, নিজের অজ্ঞতার বিষয়েও অজ্ঞ, তেমনি প্রাচীন অজ্ঞানের সময় আমরা রহস্যকে রহস্য বলিয়াই জানিতাম না। অজ্ঞানের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, সে রহস্যের একটা কল্পিত আকার আয়তন ইতিহাস, ঠিকুজি কুষ্টি পর্য্যন্ত তৈরি করিয়া ফেলে, এবং তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ প্রাচীন কবিরা রহস্যের পৌত্তলিকতা সেবা করিতেন। এখনকার কবিরা জ্ঞানের অস্ত্রে তাহার আকার আয়তন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে আরো রহস্য করিয়া তুলিতেছেন। এই নিমিত্ত প্রাচীন কালের অজ্ঞান অবস্থা কবিতার পক্ষে তেমন উপযোগী ছিল না। পৌরাণিক সৃষ্টি সমূহ দেখিলে আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। বহুকাল চলিয়া আসিয়া এখন তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া

গিয়াছে, সুতরাং এখন তাহা কবিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ এখন তাহাতে আমাদের মনে নানা ভাবের উদ্রেক করে। কিন্তু পাঠকেরা যদি ভাবিয়া দেখেন, যে, এখনকার কোন কবি যথার্থ সত্য মনে করিয়া যেরূপ করিয়া উষা বা সন্ধ্যার একটা গড়ন বাঁধিয়া দেন, সকল লোকেই যদি তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লয়, তাহা হইলে কবিতার রাজ্য কি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে! কত লোকে সন্ধ্যা ও উষাকে কল্পনায় কত ভাবে, কত আকারে দেখে, এক সময় একরকম দেখে, আর এক সময়ে আর এক রকমে দেখে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ করিলে তাহাদের সকলেরই কল্পনার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁচ তৈরি করিয়া রাখা হয়; উষা ও সন্ধ্যা যখনি তাহার মধ্যে গিয়া পড়ে তখনি একটা বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বাহির হয়।

যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে কবিতার ততই শ্রম-বিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ডকাব্য গীতি-কাব্যের সৃষ্টি হইতেছে।

চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি।

নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রকৃতির বহির্দ্বারে বসিয়া কবি হইতে যায়, তাহারা কতকগুলা বড় বড় কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্ম্মাণ করে। মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে, তাহাই কবির কল্পনা; আর গোঁজা-মিলন দিবার কল্পনা, না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার, না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিল্‌টি-করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা। যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছেন, তিনি সহজ কথার কবি, সহজ ভাবের কবি। কারণ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাহাকে দশ কথা বলিতে হয়, আর যিনি সত্য বলেন, তাঁহাকে এক কথার বেশী বলিতে হয় না। তেমনি যিনি অনুভব করিয়া বলেন তিনি দুটি কথা বলেন, আর যে অনুভব না করিয়া বলে, সে পাঁচ কথা বলে অথচ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব সহজ ভাষার, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়; সকলের প্রাণের মধ্যেই যে ব্যক্তি আতিথ্য পায়, ফুল বল, মেঘ বল, দুঃখী বল, সুখী বল, সকলের প্রাণের মধ্যেই যাহার আসন আছে, সেই তাহা পারে। আর বড় বড় কথার মোটা মোটা ভাবের কবিতা লেখা

সহজ, কারণ প্রাণের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও তাহা পারা যায়। বড় বড় কবির কবিতা অনেকের পক্ষে কুহেলিকাময়ী কেন? কারণ, তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, অধিক বকিয়া যে তাহা সহজ করিতে হইবে, ইহা তাঁহাদের মনেও হয় না; এবং তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা সকলে অনুভব করে নাই; কাজেই সকলের কাছে তাঁহাদের সে সহজ কথা নিতান্ত শক্ত হইয়া পড়ে। সহজ কথা লিখিয়াছেন বলিয়াই শক্ত। সহজ কথার গুণ এই যে, তাহা যতটুকু বলে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলে। সে সমস্তটা বলে না। পাঠকদিগকে কবি হইবার পথ দেখাইয়া দেয়, যে দিকে কল্পনা ছুটাইতে হইবে, সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র, আর অধিক কিছু করে না। নিজে যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, পাঠকদিগকেও তাহাই আবিষ্কার করাইয়া দেয়। যাহাদের কল্পনা কম, যাহাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে হয়, তাহারা এরূপ কবিতার পাঠক নহে।

আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই, তাহারই জন্য কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন। দুই একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের কথা পরিস্ফুট হইবে।

"এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কেমনে আইল বাটে?
আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া,
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

সই কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে।
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু,
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু।
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে,
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে!”

রাধা শ্যামকে প্রথম দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,

“এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে,
আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে!”

কিন্তু তাহার পরেই যে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া সখীদের ডাকিয়া কহিলেন,

“সই, কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে!”

ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে!

কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই! প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছ্বাস, ইহার মধ্যে শৃঙ্খলটী কোথায়? সে শৃঙ্খল পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা' কহিল, তাহাত সামান্য, কিন্তু রাধা যা' কহিল না তাহা কত খানি! যাহা বলা হইল না পাঠকদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে। শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ, ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গ-ভঙ্গ,এই উত্থানপতন, কত অল্প কথায় কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম দুই ছত্রে শ্যামকে দেখিয়া দুঃখ, দ্বিতীয় দুই ছত্রে সুখ, তৃতীয় দুই ছত্রে আবার দুঃখ, চতুর্থ দুই ছত্রে আবার সুখ। রাধা হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। রাধা সুখে দুঃখে আকুল হইয়া পড়িয়াছে। শেষে রাধা এই মীমাংসা করিল, শ্যাম আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে, আমি শ্যামের জন্য ততোধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।—

" সই, কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক্ সে!

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়,
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়!
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক্ সে!"

"আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক্ সে!" এই কথাটার মধ্যে কতটা কথা আছে! রাধা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর অভিশাপ খুঁজিয়া পাইল না। শত সহস্র অভিশাপের পরিবর্ত্তে সে কেবল একটি কথা কহিল। সে কহিল, "আমার পরাণ যেমন করিছে, তেমনি হউক্ সে!" ইহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি রাধার পরাণ কেমন করিতেছে! ঐ এক "যেমন করিছে" শব্দের মধ্যে নিদারুণ কষ্ট প্রচ্ছন্ন আছে, সে কষ্ট বর্ণনা না করিলে যতটা বর্ণিত হয়, এমন আর কিছুতে না। উপরি-উক্ত পদটির মধ্যে রাধা দুইবার অভিশাপ দিতে গিয়াছে, কিন্তু উহার অপেক্ষা গুরুতর অভিশাপ সে আর কোন মতে খুঁজিয়া পাইল না। ইহাতেই রাধার সমস্ত হৃদয় দেখিতে পাইলাম।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য

করিবার কবি। চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। তাঁহার প্রেম, "কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা," তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও "বিষামৃতে একত্র করিয়া।"

"কহে চণ্ডিদাস, 'শুন বিনোদিনী,
সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই।"

চণ্ডিদাস শতবার করিয়া বলিয়াছেন,

"যার যত জালা তার ততই পিরীতি।"

"সদা জালা যার, তবে সে তাহার মিলয়ে পিরীতিধন।" "অধিক জালা যার তার অধিক পিরীতি।" ইত্যাদি। কিন্তু সেই চণ্ডিদাস আবার কহিয়াছেন,

"সই পিরীতি না জানে যারা,
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা?"

পিরীতি নামক যে জালা, পিরীতি নামক যে দুঃখ, এ দুঃখ যাহারা না জানিয়াছে, তাহারা পৃথিবীতে কি সুখ পাইয়াছে? যখন রাধা কহিলেন,

"বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।"

তখন

"চণ্ডিদাস কয়, এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ!"

দুখই যদি ঘুচিল তবে আর সুখ কিসের? এত গম্ভীর কথা, বিদ্যাপতি কোথাও প্রকাশ করেন নাই। যখন মিলন হইল তখন বিদ্যাপতির রাধা কহিলেন,

"দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল,
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল।
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ,
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ।
রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল,
অধরহি পান বিরহ দূর গেল।
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ,
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ।
ভনহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি,
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি।"

চিকিৎসক চণ্ডিদাসের মতে বোধ করি ঔষধেও এ ব্যাধির উপশম হয় না, অথবা এ ব্যাধির সমুচিত ঔষধ নাই। কারণ চণ্ডিদাসের রাধা শ্যামে যখন মিলন হয় তখন "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" কিছুতেই তৃপ্তি নাই,

"নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।"

যখন কোন ভাবনা নাই, যখন শ্যামকে পাইয়াছেন, তখনো রাধার ভয় যায় না;—

"এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে,
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে।
গড়ন ভাঙ্গিতে সই, আছে কত খল,
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল।
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়,
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়!
চণ্ডিদাস কহে, রাই, ভাবিছ অনেক,
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক।"

রাধা আগেভাগে অভিশাপ দিয়া রাখে, রাধা শূন্যের সহিত ঝগড়া করিতে থাকে! এমনি তাহার ভয় যে, তাহার মনে হয় যেন সত্যই তাহার শ্যামকে কে লইল। একটা অলীক আশঙ্কা মাত্রও প্রাণ পাইয়া তাহার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া দাঁড়ায়, কাজেই রাধা তাহার সহিত বিবাদ করে। সে বলে,

"সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।"

যদিও তাহার বঁধুকে এখনো কেহ ভাঙ্গায় নি, কিন্তু তা বলিয়া সে সুস্থির হইতে পারিতেছে কৈ?

যখন শ্যাম তাহার সম্মুখে রহিয়াছে, তখনো সে শ্যামকে কহিতেছে,—

"কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান;
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন!

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি!
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের সে ওলি,
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে, দাঁড়াইয়া রও।

রাধার আর সোয়াস্তি নাই। শ্যাম সম্মুখে রহিয়াছেন, শ্যাম রাধার প্রতি কোন উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই, তবুও রাধা একটা "যদি"-কে গড়িয়া তুলিয়া, একটা "যদি"-কে জীবন দিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কহিল—

"বঁধু, যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।"

বঁধু নিদারুণ না হইতে হইতেই সে ভয়ে সশঙ্কিত। রাধার কি আর সুখ আছে?

এক দিন রাধা গৃহে গঞ্জনা খাইয়া শ্যামের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া কহিতেছে,

"তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই,
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।"

এত করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক কি? শ্যাম কি বুঝেন না? কিন্তু তবু রাধার সর্ব্বদাই মনে হয়, "কি জানি!" মনে হয়, শ্যামও পাছে

আমাকে ডাকিয়া না শুধায়। যদিও শ্যামের সেরূপ ভাব দেখে নাই, তবুও ভয় হয়। তাই অত করিয়া আজ বুঝাইতে আসিয়াছে,—

"তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই,
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে,
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ?
মোর আগে দাঁড়াও, তোমার দেখিব চাঁদ মুখ।
খাইতে সোয়াস্তি নাই, নাহি টুটে ভুক,
কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ!

রাধার এই উক্তির মধ্যে কত কথাই অব্যক্ত আছে। যেখানে রাধা বলিতেছেন,

"অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে,
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।"

এ দুই ছত্রের অর্থ এই, "আমাকে গৃহে সকলে গঞ্জনা করে, অতএব—" সে অতএব কি, তাহা কি কাহাকেও বলিতে হইবে? সেই অতএব যদি পূর্ণ না হয় তবে রাধা বিষ খাইবে। "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?" রাধা শ্যামের মুখ হইতে শুনিতে চায়, আমি তোমার ব্যথিত, আমি তোমার দুঃখ শুনিব! রাধা শ্যামকে কহিল না যে, তুমি আমার দুঃখে দুঃখ পাও, তুমি আমার ব্যথার ব্যথী হও, সে শুধু শ্যামের মুখ চাহিয়া কহিল, "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?"

চণ্ডিদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা' কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়।

"যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল,
অধিক সৌরভময়,
শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডিদাস কয়!"

দুঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়। যতই ঘর্ষিত হইবে, ততই সৌরভ বাহির হইবে। চণ্ডিদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

"পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা?
বিরিখের ফল নহেত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে,
পিরীতি রতন লভিল সে জন,
বড় ভাগ্যবান সে।
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে,

পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস,
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ।"

পরকে আপন করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, যে তপস্যা করিতে হয়, সে কি সাধারণ তপস্যা? যে তোমার অধীন নহে তোমার নিজেকে তাহার অধীন করা, যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তোমার নিজেকে তাহার কাছে পরতন্ত্র করা, যাহার সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তোমার নিজের ইচ্ছাকে তাহার আজ্ঞাকারী করা; সে কি কঠোর সাধন!

যখন রাধিকা কহিলেন,

"পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে,
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা!
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা।
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল,

বিষম অনল নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল !"

তখন চণ্ডিদাস কহিলেন,

"চণ্ডিদাস বাণী শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা,
পিরীতি লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা !"

বিদ্যাপতির ন্যায় কবিগণ যাঁহারা সুখের জন্য প্রেম চান, তাঁহারা প্রেমের জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম। কিন্তু চণ্ডিদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন,

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।"

কিন্তু ইহা বলিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না, দ্বিতীয় ছত্রে কহিলেন,

"এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর !"

প্রেমের আড়ালে জগৎ ঢাকা পড়ে। শুধু তাহাই নহে,—

পরাণ সমান পিরীতি রতন
জুকিনু হৃদয়-তুলে,
পিরীতি রতন অধিক হইল,
পরাণ উঠিল চুলে।

চণ্ডিদাস হৃদয়ের তুলা-দণ্ডে মাপিয়া দেখিলেন, প্রাণের অপেক্ষা

প্রেম অধিক হইল। এইত জগৎগ্রাসী, প্রাণ হইতে গুরুতর প্রেম ইহা আবার নিত্যই বাড়িতেছে, বাড়িবার স্থান নাই, তথাপি বাড়িতেছে,

"নিতই নূতন পিরীতি দু জন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়;
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি থায়।"

ইহার আর পরিণাম নাই।

এত বড় প্রেমের ভাব চণ্ডিদাস ব্যতীত আর কোন্ প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায়? বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চণ্ডিদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। তাহা শতবার উদ্ধৃত হইয়াছে, আবার উদ্ধৃত করি।

সখিরে, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু

তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
যত যত রসিক জন রস অনুগমন,
অনুভব কহে, না পেখে,
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে।"

বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু চণ্ডিদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন। তিনি নিজের রজকিনী প্রণয়িনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করি,—

শুন রজকিনী রামি,
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।
তুমি বেদ-বাগিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা,
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা।
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়,
রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডিদাসে গায়।

চণ্ডিদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ প্রেম ছিল! তিনি প্রেম ও উপভোগ

উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন "কামগন্ধ নাহি তায়!"

আর এক স্থলে চণ্ডিদাস কহিয়াছেন,

"রজনী দিবসে হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা,
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।"

দিবস রজনী পরবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব। একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না।—অর্থাৎ এ প্রেম বাহ্য জগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধ মাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে। যে কালে চণ্ডিদাস ইহা লিখিয়াছিলেন, ইহা সে কালের কথা নয়।

কঠোর ব্রত সাধনা স্বরূপে প্রেম সাধনা করা চণ্ডিদাসের ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে; পূর্ব্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে, যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে, যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা করিয়া রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে, যখন হৃদয়ের দ্বার দিবারাত্রি উদ্ঘাটিত

থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাইবেন,

পিরীতি নগরে বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব,
তা' বিনু সকলি পর।

বসন্তরায়।

কেহ কেহ অনুমান করেন, বসন্তরায় আর বিদ্যাপতি একই ব্যক্তি। এই মতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু আছে কি না জানি না, কিন্তু উভয়ের লেখা পড়িয়া দেখিলে উভয়কে স্বতন্ত্র কবি বলিয়া আর সংশয় থাকে না। প্রথমত, উভয়ের ভাষায় অনেক তফাৎ। বিদ্যাপতির লেখায়—ব্রজভাষায় বাঙ্গালা মেশান,' আর রায়বসন্তের লেখায়—বাঙ্গালায় ব্রজভাষা মেশান'। ভাবে বোধ হয় যেন, ব্রজভাষা আমাদের প্রাচীন কবিদের কবিতার আফিসের বস্ত্র ছিল। শ্যামের বিষয় বর্ণনা করিতে হইলেই অমনি সে আটপৌরে ধুতি চাদর ছাড়িয়া বৃন্দাবনী চাপকানে বত্রিশটা বোতাম আঁটিত ও বৃন্দাবনী শাম্‌লা মাথায় চড়াইয়া একটা বোঝা বহিয়া বেড়াইত। রায় বসন্ত প্রায় ইহা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। তিনি খানিকক্ষণ বৃন্দাবনী পোষাক পরিয়াই অমনি—"দূর কর" বলিয়া ফেলিতেন। বসন্তরায়ের কবিতার ভাষাও যেমন, কবিতার ভাবও তেমন। সাদাসিধা; উপমার ঘনঘটা নাই; সরল প্রাণের সরল কথা; সে কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়াই মিথ্যা। কারণ, সরল প্রাণ বিদেশী ভাষায় কথা কহিতে পারেই না; তাহার ছোট ছোট সুকুমার কথাগুলি, তাহার

সূক্ষ্ম, স্পর্শ-কাতর ভাবগুলি বিদেশী ভাষার গোলেমালে একেবারে চুপ করিয়া যায়, বিদেশী ভাবার জটিলতার মধ্যে আপনাদের হারাইয়া ফেলে। তখন আমরা ভাষাই শুনিতে পাই, উপমাই শুনিতে পাই, সে সুকুমার ভাবগুলির প্রাণ-ছোঁয়া কথা আর শুনিতে পাই না। এমন মানুষত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের দেখিলে মনে হয়, মনুষটা পোষাক পরে নাই, পোষাকটাই মানুষ পরিয়া বসিয়াছে। পোষাককে এমনি সে সমীহ করিয়া চলে যে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, আপনাকে সে পোষাক ঝুলাইয়া রাখিবার আল্না মাত্র মনে করে, পোষাকের দামেই তাহার দাম। আমার ত বোধ হয়, অনেক স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ঘোমটার চেয়ে অধিক কাজ করে, তাহার হীরার সিঁথিটার দিকে লোকে এতক্ষণ চাহিয়া থাকে যে তাহার মুখ দেখিবার আর অবসর থাকে না। কবিতারও সেই দশা আমরা প্রায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডিদাসের তুলনা করিলেই টের পাওয়া যাইবে যে, বিদ্যাপতির অপেক্ষা চণ্ডিদাস কত সহজে সরল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আবার বিদ্যাপতির সহিত বসন্তরায়ের তুলনা করিলেও দেখা যায়, বিদ্যাপতির অপেক্ষা বসন্তরায়ের ভাষা ও ভাব কত সরল। বসন্তরায়ের কবিতায় প্রায় কোন খানেই টানাবোনা তুলনা নাই, তাহার মধ্যে কেবল সহজ কথার যাদুগিরি আছে। যাদুগিরি নহে ত কি? কিছুই বুঝিতে পারি না, এ গান শুনিয়া প্রাণের মধ্যে কেন এমন মোহ উপস্থিত হইল,—কথাগুলিও ত খুব পরিষ্কার, ভাব গুলি ও ত খুব সোজা, তবে উহার মধ্যে এমন কি আছে, যাহাতে আমার প্রাণে এতটা আনন্দ, এতটা সৌন্দর্য্য আনিয়া দেয়? এইখানে

দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। প্রথমে বিদ্যাপতির রাধা, শ্যামের রূপ কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিই,—

এ সখি কি দেখনু এক অপরূপ,
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ।
কমল যুগল পর চাঁদকি মাল,
তা পর উপজল তরুণ তমাল।
তা পর বেড়ল বিজুরী লতা,
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা।
শাখা-শিখর সুধাকর পাঁতি,
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি।
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ,
তা পর কির থির করু বাস।
তা পর চঞ্চল খঞ্জন যোড়,
তা পর সাপিনী ঝাঁপল মোড়।

আর বসন্তরায়ের রাধা শ্যামকে দেখিয়া কি বলিতেছেন ?

সজনি, কি হেরনু ও মুখ শোভা!
অতুল কমল সৌরভ শীতল,
অরুণ নয়ন অলি আভা।
প্রফুল্লিত ইন্দীবর বর সুন্দর
মুকুর-কান্তি মনোৎসাহা।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত,
কিয়ে নিরমল শশি-শোহা।

বরিহা বকুল ফুল অলিকুল আকুল,
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ।
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণি কুণ্ডল
প্রিয় অবতংস বনান।
হাসিখানি তাহে ভায়, অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়,
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুলশীল দিনু তায়।
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে দেখিলে না হিয়া বাঁধে,
অনুখন মদন তরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ,
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ।
চরণে নূপুর মণি সুমধুর ধ্বনি শুনি
ধরণীক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপ-সাগরে রস— হিলোলে নয়ন মন
আটকল রায় বসন্ত॥

বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত কবিতাটি পড়িয়াই বুঝা যায়, এই কবিতাটি রচনা করিবার সময় কবির হৃদয়ে ভাবের আবেশ উপস্থিত হয় নাই। কতকগুলি টানাবোনা বর্ণনা করিয়া গোটাকতক ছত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হয় যেন, বিদ্যাপতি কৃষ্ণ হইয়া রাধার রূপ উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু রাধা হইয়া কৃষ্ণের রূপ উপভোগ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা ব্যতীত প্রাচীন কাব্য

সংগ্রহে বিদ্যাপতি-রচিত আর একটি মাত্র কৃষ্ণের রূপবর্ণনা আছে,তাহাও অতি যৎসামান্য। বসন্তরায়ের কৃষ্ণের বর্ণনা পড়িয়া দেখ। কবি এমনি ভাবে মুগ্ধ হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন যে, প্রথম ছত্র পড়িয়াই আমাদের প্রাণের তার বাজিয়া ওঠে। "সজনি, কি হেরিনু ও মুখ-শোভা!" শ্যামকে দেখিবামাত্রই যে বন্যার মত এক সৌন্দর্য্যের স্রোত রাধার মনে আসিয়া পড়িয়াছে, রাধার হৃদয়ে সহসা যেন একটা সৌন্দর্য্যের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—একেবারে সহসা অভিভূত হইয়া রাধা বলিয়া উঠিয়াছে—"সজনি কি হেরনু ও মুখ-শোভা!" আমরা রাধার সেই সহসা উচ্ছ্বসিত ভাব প্রথম ছত্রেই অনুভব করিতে পারিলাম। শ্যামকে দেখিবামাত্রই তাঁহার প্রথম মনের ভাব মোহ। প্রথম ছত্রে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সমস্তটা আপ্লুত করিয়া একটা সৌন্দর্য্যের ভাব মাত্র বিরাজ করিতেছে। রাধা মাঝে মাঝে রূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মনঃপূত না হওয়ায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন—"রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত।" তাহার রূপ কেমন তাহা আমি কি জানি, তাহার রূপ দেখিয়া আমার চিত্ত কেমন হইল, তাহাই আমি জানি। রাধা মাঝে মাঝে বর্ণনা করিতে যায়, অমনি বুঝিতে পারে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিলে খুব অল্পই বলা হয়, আমি যে কি আনন্দ পাইতেছি, সেটা তাহাতে কিছুতেই ব্যক্ত হয় না। শ্যামের রূপের আবৃতিত সজনিরা সকলেই দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু রাধা যে সেই রূপের মধ্যে আরো অনেকটা দেখিতে পাইয়াছে, যাহা দেখিয়া তাহার মনে কথার অতীত কথা সকল জাগিয়া উঠিয়াছে সেই অধিক দেখাটা ব্যক্ত করিবে কিরূপে? সে কি তিল তিল বর্ণনা

করিয়া? বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়া হতাশ হইয়া বর্ণনা বন্ধ করিয়া কেবল ভাব গুলি মাত্র ব্যক্ত করিতে হয়। হাসি বর্ণনা করিতে গিয়া "হাসি খানি" বলিতে হয়, রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মুরলীর গান মনে পড়ে। শ্যামের ভাব—রূপেতে হাসিতে গানেতে জড়িত একটি ভাব, পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিগত একটি ভাব নহে। রাধা যে বলিয়াছেন, "হেরইতে চাঁদমুখ মরমে পরম সুখ" ঐ কথাটাই সত্য, নহিলে "ভুরু বাঁকা" বা "চোক টানা" বা "নাক সোজা" ও সব কথা কোন কাজের কথাই নয়।

বিদ্যাপতি রচিত রূপবর্ণনার সহিত বসন্তরায়-রচিত রূপ-বর্ণনার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। বিদ্যাপতি রূপকে একরূপ চক্ষে দেখিতেছেন, আর বসন্ত রায় তাহাকে আর এক চক্ষে দেখিতেছেন। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রূপ উপভোগ্য বলিয়া সুন্দর; আর বসন্তরায় কহিতেছেন, রূপ সুন্দর বলিয়া উপভোগ্য। ইহা সত্য বটে, সৌন্দর্য্য ও ভোগ একত্রে থাকে, কিন্তু ইহাও সত্য উভয়ে এক নহে। বসন্তরায় তাঁহার রূপবর্ণনায় যাহা কিছু সুন্দর তাহাই দেখাইয়াছেন, আর বিদ্যাপতি তাঁহার রূপ-বর্ণনায় যাহা কিছু ভোগ্য তাহাই দেখাইয়াছেন। উদাহরণ দেওয়া যাক্। বিদ্যাপতির—যেখান হইতে খুসী—একটি রূপ-বর্ণনা বাহির করা যাক্—

গেলি কামিনী গজবর গামিনী,
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুমসায়ক
কুহকী ভেল বর-নারী।

জোরি ভুজ যুগ মোড় বেড়ল
তততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরভাবে শরদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহ কওর।
চরণ যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥

এমন, একটা কেন, এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আবার রায়বসন্ত হইতে দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক্।

সই লো কি মোহন রূপ স্মঠাম,
হেরইতে মানিনী তেজই মান॥
উজর নীলমণি মরকত ছবি জিনি
দলিতাঞ্জন হেন ভাল।
জিনিয়া যমুনার জল নিরমল ঢলঢল
দরপণ নবীন রসাল॥
কিয়ে নবনীল নলিনী, কিয়ে উতপল
জলধর, নহত সমান।

কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল
কেবল রস নিরমাণ ॥
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর
সুরঙ্গ অধর পরকাশ,
ঈষৎ মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ,
রায় বসন্ত পহু রঙ্গিনী বিলাস ॥

ইহাতে কেবল ফুল, কেবল মধুর হাসি ও সরস সম্ভাষণ আছে, কেবল সৌন্দর্য্য আছে। এক শ্যামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া জগতের সৌন্দর্য্যের রাজ্য উদ্ঘাটিত হইতে চাহে। যমুনার নিরমল ঢলঢল ভাব ফুটিয়া উঠে, একে একে একেকটি ফুল শ্যামের মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, (কারণ সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যকে কাছে ডাকিয়া আনে) ফুলের যাহা প্রাণের ভাব সে তাহা উন্মুক্ত করিয়া দেয়। বসন্তরায় এ সৌন্দর্য্য মুগ্ধ-নেত্রে দেখিয়াছেন, লালসা-তৃষিত নেত্রে দেখেন নাই! এমন, একটি কেন—রায় বসন্ত হইতে তাঁহার সমুদয় রূপ-বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায়—দেখান যায় যে, যাহা তাঁহার সুন্দর লাগিয়াছে, তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। রূপ-বর্ণনা ত্যাগ করা যাক্—সম্ভোগ-বর্ণনা দেখা যাক্। বিদ্যাপতি কেবল সম্ভোগ মাত্রই বর্ণনা করিয়াছেন, বসন্তরায় সম্ভোগের মাধুর্য্য-টুকু, সম্ভোগের কবিত্বটুকুমাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি-রচিত "বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল" ইত্যাদি পদটির সহিত পাঠকেরা বসন্তরায়-রচিত নিম্নলিখিত পদটির তুলনা করুন।

বড় অপরূপ দেখিনু সজনি
নয়লি কুঞ্জের মাঝে,
ইন্দ্রনীল মণি কেতকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম-শয়ানে মিলিত নয়ানে
উলসিত অরবিন্দ,
শ্যাম সোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চাঁদের উপরে চন্দ॥
কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরে রঞ্জিত,
তাহে পিককুল গান,
মরমে মদন বাণ দুঁহে অগেয়ান,
কি বিধি কৈল নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ পবন বহে মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস-ধন দোঁহার দুঁহু জন,
কহয়ে রায় বসন্ত॥

মৃদু বাতাস বহিতেছে, কুঞ্জে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, চাঁদনী রাত্রে কোকিল ডাকিতেছে, এবং সেই কুঞ্জে, সেই বাতাসে, সেই জ্যোৎস্নায়, সেই কোকিলের কুহুরবে, কুসুম-শয়ানে, মুদিত নয়ানে, দুটি উলসিত অলসিত অরবিন্দের মত শ্যামের কোলে রাধা—চাঁদের উপর চাঁদ ঘুমাইয়া আছে। কি মধুর! কি সুন্দর। এত সৌন্দর্য্য স্তরে স্তরে একত্রে গাঁথা হইয়াছে—সৌন্দর্য্যের পাপ্‌ড়ির উপরে পাপ্‌ড়ি

বিন্যাস হইয়াছে, যে সমস্তুদ্ধ লইয়া একটি সৌন্দর্য্যের ফুল, একটি সৌন্দর্য্যের শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ও সুখ কো করু অন্ত" এমন মিলন কোথায় হইয়া থাকে!

বসন্তরায়ের কবিতায় আর একটি মোহমন্ত্র আছে, যাহা বিদ্যাপতির কবিতায় সচরাচর দেখা যায় না। বসন্তরায় প্রায় মাঝে মাঝে বস্তুগত বর্ণনা দূর করিয়া দিয়া এক কথায় এমন একটি ভাবের আকাশ খুলিয়া দেন, যে, আমাদের কল্পনা পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া যায়, মেঘের মধ্যে হারাইয়া যায়! এক স্থলে আছে—"রায় বসন্ত কহে ওরূপ পিরীতিময়।" রূপকে পিরীতিময় বলিলে যাহা বলা হয়, আর কিছুতে তাহার অপেক্ষা অধিক বলা যায় না। যেখানে বসন্তরায় শ্যামের রূপকে বলিতেছেন।—

কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল
কেবল রস নিরমাণ।"

সেখানে কবি এমন একটি ভাব আনিয়াছেন, যাহা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সেই ধরা-ছোঁয়া দেয় না—এমন একটি ভাবকে ধরিবার জন্য কবি যেন আকুল ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। "কমনীয়" "কিশোর" "সুকোমল" প্রভৃতি কত কথাই ব্যবহার করিলেন, কিছুতেই কুলাইয়া উঠিল না—অবশেষে সহসা বলিয়া ফেলিলেন "কেবল রস নিরমাণ!" কেবল তাহা রসেই নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার আর আকার প্রকার নাই।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন ;——

"আলো ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব?

তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ?
তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুঞ্জ-রাশি,
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি।
আনন্দ-মন্দির তুমি, জ্ঞান শকতি,
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মুরতি।
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম ॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥”

এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহার কএকটি সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি আমার কামনার মূর্ত্তি, আমার মূর্ত্তিমতী কামনা—অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছ, ইহা কি সুন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্তি হয়;—না—তুমি তাহারো অধিক, তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই;—না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্ব্ব শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া যাহা রহিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শরীর বাঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ;—রায় বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারো অধিক, তুমি প্রাণেরো গুরুতর, তুমি বুঝি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বুঝি প্রাণ আছে! ঐ যে বলা হইয়াছে “মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি!” ইহাতে হাসির

মাধুর্য্য কি সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে! বসন্তের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, সুদূর বাঁশীর ধ্বনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়, পদ্ম-মৃণাল কাঁপিয়া সরোবরে একটু খানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়, তেমনি একটু-খানি হাসি—অতি মধুর অতি মৃদু একটি হাসি মরমে আসিয়া লাগি-তেছে; বাতাসটি গায়ে লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোক বুজিয়া আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে! হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মত প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে।

রাধা বলিতেছেন—

প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি?
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি!
না দেখি নয়ন ঝরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন, মূরছিত হেন
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি॥
শ্রবণে শুনিয়ে তোমার চরিত্র,
আন না ভাবিয়ে মনে।
নিমিষের আধ পাশরিতে নারি
ঘুমালে দেখি স্বপনে!
জাগিলে চেতন হারাই যে আমি
তোমা নাম করি কাঁদি।

পরবোধ দেই এ রায়-বসন্ত
তিলেক থির নাহি বাঁধি॥

ইহার প্রথম দুটি ছত্রে, ভাবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" ইহাতে কতখানি আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে! আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি যে করিতে চায় কিছু বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম এত পাইলাম, তবুও প্রাণ আজও বলিতেছে "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল!"

বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে। "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" দ্বিতীয় ছত্রে রাধা শ্যামের মুখের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া কহিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!" যাহার একতিল ঊর্দ্ধে উঠিলেই ভাষা মরিয়া যায়, সেই ভাষার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া রাধা বলিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!"

আর এক স্থলে রাধা বলিতেছেন—

ওহে নাথ, কিছুই না জানি,
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী।
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি,
পরাণ পুতলী তুমি জীবনের সখি!

অঙ্গ আভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন,
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন !
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি,
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি!"

ঠিক কথা বটে,—নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি! যতই সময় পাওয়া যায়, ততই কাজ করা যায়। আমাদের হাতে "শতেক যুগ" নাই বলিয়া আমাদের অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। শতেক যুগ পাইলে আমরা অনেক কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু প্রেমের সময় গণনা যুগ যুগান্তর লইয়া নহে। প্রেম নিমিখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে, এই নিমিত্ত প্রেমের সর্ব্বদাই ভয়, পাছে নিমিখ হারাইয়া যায়। এক নিমিখেমাত্র আমি যে একটি চাহনি দেখিয়াছিলাম, তাহাই হৃদয়ের মধ্যে লালন করিয়া আমি শতেক যুগ বাঁচিয়া থাকিতে পারি; আবার হয়ত আমি শতেক যুগ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, কখন আমার একটি নিমেষ আসিবে একটি মাত্র চাহনি দেখিব! দৈবাৎ সেই একটি মুহূর্ত্ত হারাইলে আমার অতীত কালের শতেক যুগ ব্যর্থ হইল, আমার ভবিষ্যৎ কালের শতেক যুগ হয়ত নিস্ফল হইবে। প্রতিভার স্ফূর্ত্তির ন্যায় প্রেমের স্ফূর্ত্তিও একটি মাহেন্দ্র ক্ষণ একটি শুভ মুহূর্ত্তের উপরে নির্ভর করে। হয়ত শতেক যুগ আমি তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, তবুও তোমাকে ভাল বাসিবার কথা আমার মনেও আসে নাই—কিন্তু দৈবাৎ একটি নিমিখ আসিল, তখন না জানি কোন্ গ্রহ কোন্ কক্ষে ছিল—দুই জনে চোখোচোখি হইল, ভাল বাসিলাম। সেই এক নিমিখ হয়ত পদ্মার তীরের মত অতীত শত যুগের পাড় ভাঙ্গিয়া দিল ও ভবি-

ব্যং শত যুগের পাড় গড়িয়া দিল। এই নিমিত্তই রাধা যখন ভাগ্য-ক্রমে প্রেমের শুভ-মুহূর্ত্ত পাইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতিক্ষণে ভয় হয় পাছে এক নিমিখ হারাইয়া যায়, পাছে সেই এক নিমিখ হারাইয়া গেলে শতেক যুগ হারাইয়া যায়। পাছে শতেক যুগের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া সেই নিমিখের হারাণ' রত্নটুকু আর খুঁজিয়া না পাওয়া যায়! সেই জন্য তিনি বলিয়াছেন "নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি!"

এমন যতই উদাহরণ উদ্ধৃত হইবে, ততই প্রমাণ হইবে যে, বিদ্যা-পতি ও বসন্তরায় এক কবি নহেন, এমন কি, এক শ্রেণীর কবিও নহেন।

বাউলের গান।

সঙ্গীত সংগ্রহ। বাউলের গাথা।

এমন কোন কোন কবির কথা শুনা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনের প্রারম্ভ ভাগে পরের অনুকরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—অনক কবিতা লিখিয়াছেন, অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সে গুলি শুনিলে মনে হয় যেন, তাহা কোন একটি বাঁধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না। অবশেষে এইরূপ লিখিতে লিখিতে চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে সহসা নিজের যেখানে মর্ম্মস্থান, সেই থানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আর তাঁহার বিনাশ নাই। এবার তিনি যে গান গাহিলেন, তাহা শুনিয়াই আমরা কহিলাম, বাঃ, এ কি শুনিলাম! এ কে গাহিল! এ কি রাগিণী! এত দিন তিনি পরের বাঁশি ধার করিয়া নিজের গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণের সকল সুর কুলাইত না। তিনি ভাবিয়া পাইতেন না—যাহা বাজাইতে চাহি তাহা বাজে না কেন! সেটা যে বাঁশির দোষ! ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা দেখিলেন তাঁহার প্রাণের মধ্যেই একটা বাদ্য আছে। বাজাইতে গিয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "এ কি হইল! আমার গান পরের গানের মত

শোনায় না কেন? এত দিন পরে আমার প্রাণের সকল সুরগুলি বাজিয়া উঠিল কি করিয়া? আমি যে কথা বলিব মনে করি সেই কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে।" যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই। সে কথা কহিয়া কি সুখীই হয়! তাহার এক একটি কথা তাহার এক একটি জীবিত সন্তান। ঘরের কাছে একটি উদাহরণ আছে। বঙ্কিম বাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন, তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লেখা ভাল হইয়াছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে সর্ব্বত্র তিনি তাঁহার নিজের সুর ভাল করিয়া লাগাইতে পারেন নাই। কেহ যদি প্রমাণ করে, যে, কোন একটি ক্ষমতাশালী লেখক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু কেহ যদি বলে, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, বা বঙ্কিম বাবুর শেষ-বেলাকার লেখা গুলি অনুকরণ, তবে সে কথা আমরা কানেই আনি না।

ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যাহা খাটে, জাতি সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতির যথার্থ ভাষাটি যে কি, তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই— বাঙ্গালী জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা ভাল জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। পড়িয়া মনে হয় না, বাঙ্গা-

লীতেই ইহা লিখিয়াছে, বাঙ্গলাতেই ইহা লেখা সম্ভব, এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে, তাহারা বাঙ্গালীর হৃদয়-জাত একটি নূতন জিনিষ লাভ করিতে পারিবে। ভাল হউক মন্দ হউক্ আজ কাল যে সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যেন এমন লেখা ইংরাজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ, এখনো আমরা বাঙ্গালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই! সংস্কৃত-বাগীশেরা বলিবেন, ঠিক কথা বলিয়াছ, আজকালকার লেখায় সমাস দেখিতে পাই না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথার আদর নাই, এ কি বাঙ্গালা! আমরা তাঁহাদের বলি. তোমাদের ভাষাও বাঙ্গলা নহে, আর ইংরাজি-ওয়ালাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে। ছেলে কোলে করিয়া সহরময় ছেলে খুঁজিয়া বেড়ান যেমন, তোমাদের ব্যবহারও তেমনি দেখিতেছি। তোমরা বাঙ্গালা বাঙ্গালা করিয়া সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সংস্কৃত ইংরাজি সমস্ত ওলট্-পালট্ করিতেছ, কেবল একবার হৃদয়টার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ নাই। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে একটি গান আছে—

"আমি কে তাই আমি জান্‌লেম না,
আমি আমি করি কিন্তু, আমি আমার ঠিক হইল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি.
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কই গণি!"

আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙ্গালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।

যাঁহাদের প্রাণ বিদেশী হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কথায় কথায় বলেন—ভাব সর্ব্বত্রই সমান। জাতি-বিশেষের বিশেষ সম্পত্তি কিছুই নাই। কথাটা শুনিতে বেশ উদার, প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের মনে একটি সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের স্বত্ব লোপ করিতে চায়। উপরে যে মতটি প্রকাশিত হইল, তাহা চৌর্য্য-বৃত্তির একটি সুশ্রাব্য ছুতা বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা ইংরাজি হইতে দুই হাতে লুট করিতে থাকেন, বাঙ্গালাটাকে এমন করিয়া তোলেন, যাহাতে তাহাকে আর ঘরের লোক বলিয়া মনে হয় না, তাঁহারাই বলেন ভাষা-বিশেষের নিজস্ব কিছুই নাই, তাঁহারাই অম্লান বদনে পরের সোণা কানে দিয়া বেড়ান। আমারই যে নিজের সোণা আছে এমন নয়, কিন্তু তাই বলিয়া একটা মতের দোহাই দিয়া সোণাটাকে নিজের বলিয়া জাঁক করিয়া বেড়াই না। ভিক্ষা করিয়া থাকি, তাহাতেই মনে মনে ধিক্কার জন্মে, কিন্তু অমন করিলে যে স্পষ্ট চুরি করা হয়।

সাম্য এবং বৈষম্য, দুটাকেই হিসাবের মধ্যে আনা চাই। বৈষম্য না থাকিলে জগৎ টিকিতেই পারে না। সব মানুষ সমান বটে, অথচ সব মানুষ আলাদা। দুটো মানুষ ঠিক এক ছাঁচের, এক ভাবের পাওয়া অসম্ভব, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তেমনি দুইটি স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে মনুষ্য স্বভাবের সাম্যও আছে,

বৈষম্যও আছে। আছে বলিয়াই রক্ষা, তাই সাহিত্যে আদান প্রদান বাণিজ্য ব্যবসায় চলে। উত্তাপ যদি সর্ব্বত্র একাকার হইয়া যায়, তাহা হইলে হাওয়া খেলায় না, নদী বহে না, প্রাণ টেকে না। একাকার হইয়া যাওয়ার অর্থই পঞ্চত্ব পাওয়া। অতএব আমাদের সাহিত্য যদি বাঁচিতে চায় তবে, ভাল করিয়া বাঙ্গালা হইতে শিখুক।

ভাবের ভাষায় অনুবাদ চলে না। ছাঁচে ঢালিয়া শুষ্ক জ্ঞানের ভাষার প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করা যায়। কিন্তু ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্য পান করিয়া, হৃদয়ের সুখ দুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে। সুতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটা নির্জ্জীব প্রতিমা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না, ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণ-ভারের মত চাপিয়া পড়িয়া থাকে। Force of Gravitation-কে ভারাকর্ষণ শক্তি বলিলে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু ইংরাজিতে Liberty, ও Freedom শব্দে যে ভাবটি মনে আসে, বাঙ্গালায় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য শব্দে ঠিক সে ভাবটি আসে না, কোথায় একটু খানি তফাৎ পড়ে। ইংরাজিতে যেখানে বলে, "Free as mountain air," আমরা যদি সেইখানে বলি "পর্ব্বতের বাতাসের মত স্বাধীন," তাহা হইলে কি কথাটা প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে? আমরা আজকাল ইংরাজীর ভাবের ভাষাকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতেছি—মনে করিতেছি ইংরাজি ভাবটি বুঝি ঠিক বজায় রাখিলাম, কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? আমাদের সাহিত্যে এখন ইংরাজি-ওয়ালারা যাহা লেখেন, ইংরাজি-ওয়ালারাই তাহা পড়েন, ভাবগুলিকে মনে মনে ইংরাজিতে অনুবাদ

করিয়া লন—তাঁহাদের যাহা কিছু ভাল লাগে, ইংরাজির সহিত মিলিতেছে মনে করিয়া ভাল লাগে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইংরাজি বুঝে না, সে ব্যক্তিকে ঐ লেখা পড়িতে দাও, কথাগুলি তাহার প্রাণের মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পারে তবেই বুঝিলাম যে, হাঁ, ইংরাজি ভাবটা বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নহিলে অনুবাদ করিলেই যে, ইংরাজি বাঙ্গালা হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই।

অতএব, বাঙ্গালা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই সঙ্গীত-সংগ্রহের প্রকাশক বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

Universal love প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়ই ভাল শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছায় না কেন?

আয়রে আয়, জগাই মাধাই আয়।
হরি-সঙ্কীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়।
(ওরে) মার খেয়েচি না হয় আরো খাব;
ওরে তবু হরির নামটি দিব আয়
ওরে মেরেছে কলসীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না আয়।"

বাউল বলিতেছে,

"সে প্রেম করতে গেলে মরতে হয়।
আত্ম-সুখীর মিছে সে প্রেমের আশয়।"

গোড়াতেই মরা চাই। আত্মহত্যা না করিলে প্রেম করা হয় না। (পূর্ব্বেই আর একটি গানে বলা হইয়াছে,—

"যার আমি মরেছে, তার সাধন হয়েছে,
কোটি জন্মের পুণ্যের ফল তার উদয় হয়েছে।)"

তার পরে বলিতেছে,—

"যে প্রাণ ক'রে পণ, পরে প্রেম-রতন
তার থাকে না যমের ভয়।"

যে মরে তার আর মরণের ভয় থাকে না। জগৎকে সে ভাল-বাসে এই জন্য সে জগৎ হইয়া যায়, সে একটি অতি ক্ষুদ্র "আমি" মাত্র নহে, যে যমের ভয় করিবে; সে সমস্ত বিশ্ব চরাচর।

অপ্রেমিক বলিবে, এ প্রেমে লাভ কি? ফুলকে জিজ্ঞাসা কর না কেন, গন্ধদান করিয়া তোমার লাভ কি? সে বলিবে গন্ধ না দিয়া আমার থাকিবার যো নাই, তাহাই আমার ধর্ম্ম। এই জন্য গন্ধ না দিতে পারিলে জীবন বৃথা মনে হয়। তেমনি প্রেমিক বলিবে মরণই আমার ধর্ম্ম, না মরিয়া আমার সুখ নাই।

"লোভী লোভে গণিবে প্রমাদ,
একের জন্য কি হয় আরের মরতে সাধ।"

বাউল উত্তর করিল,

"যার যে ধর্ম্ম, সেই পাবে সে কর্ম্ম,
প্রেমের মর্ম্ম কি অপ্রেমিকে পায়?"

বাউল বলিতেছে, সমস্ত জগতের গান শুনিবার এক যন্ত্র আছে—

ভাবের আজগবি কল গৌরচাঁদের ঘরে—

সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর আন্‌ছে একতারে—
গো সখি, প্রেম-তারে।

প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমিষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহার কাছে বসিয়া থাক, অদৃশ্য প্রেমের তার দিয়া তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে থাকে, নিমেষে নিমেষে তাহার প্রাণের খবর তোমার প্রাণে আসিয়া পৌঁছায়; তেমনি যদি জগতের প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ প্রেমের তারে বাঁধা থাকে, তাহা হইলে জগতের ঘরের কথা সমস্তই তুমি শুনিতে পাও। প্রেমের মহিমা এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে!

জগতের প্রেমে আমরা কেন মজিতে চাহি না? আমরা আপনাকে বজায় রাখিতে চাই বলিয়া। আমরা চাই আমি বলিয়া এক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব, তাহাকে কোন মতে হাতছাড়া করিব না। জগৎকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে প্রেমের জাল পাতা রহিয়াছে। অহর্নিশি জগতের চেষ্টা তোমাকে তাহার সহিত এক করিয়া লইতে। জগতের ইচ্ছা নহে যে, তাহার কোন একটা অংশ, কোন একটা ঢেউ, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া জগতের স্রোতকে লুট্‌ করিয়া দিয়া উজানে বহিয়া যায়। সে চায় সকল ঢেউগুলি এক স্রোতে বহে, এক গান গায়; তাহা হইলেই সমস্ত জগতের একটি সামঞ্জস্য থাকে, জগতের মহাগীতের মধ্যে কোনখানে বেসুরা লাগে না। এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি জগতের প্রতিকূলে আমি আমি করিয়া খাড়া থাকিতে চায়, সে ব্যক্তি বেশী দিন টিঁকিতে পারে না। ক্ষুদ্র নিজের

নিঃসৃত, সুদীর্ঘ অতীতকালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বিশ্ব-সাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল! যদি কোন সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে হৃদয় কি প্রসন্ন হয়! প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদিগের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে। অতীতকালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায় সে হৃদয় কি মরুভূমি!

ঐ বুঝি এসেছি বৃন্দাবন।
আমায় বলে দেরে নিতাইধন॥
ওরে বৃন্দাবনের পশু পাখীর রব শুনিনা কি কারণ!
ওরে বংশিবট, অক্ষয় বট, কোথারে তমাল বন!
ওরে বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি কারণ!
ওরে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কোথা গিরি গোবর্দ্ধন!

কেন এ বিলাপ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া। তা যদি না হইত, যদি আজ সেই কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত, তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাঁধা দেখিতাম।

সমস্যা।

আজকাল প্রায় এমন দেখা যায় অনেক বিষয়ে অনেক রকম মত উঠিয়াছে, কিন্তু কাজের সঙ্গে তাহার মিল হয় না। এমনও দেখা যায় অল্প বয়সে যাঁহারা পরমোৎসাহে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সমাজের পরিবর্ত্তন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে তাঁহারাই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া শান্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অনেকে ইহার কারণ এমন বলেন যে বাঙ্গালীদের কোন মতের বা কাজের উপরে যথার্থ অকৃত্রিম সুগভীর অনুরাগ নাই—মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হৃদয়ের যতটা বলের আবশ্যক তাহা নাই। একথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা নহে, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কতগুলি কারণ জুটিয়াছে।

সমাজ যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় তখন মানুষ সবলে কাজ করিতে পারে না, যখন ডান পা একটি গর্ত্তের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া বাঁ পা কোথায় রাখিব ভাবিয়া পাওয়া যায় না, তখন দ্রুতবেগে চলা অসম্ভব। কিম্বা যখন মাথা টলমল করিতেছে কিন্তু পা শক্ত আছে, অথবা মাথার ঠিক আছে কিন্তু পায়ের ঠিকানা নাই—তখন যদি চলিবার বিশেষ ব্যাঘাত হয় তবে জমির দোষ দেওয়া যায় না। আমরা বঙ্গসমাজ নামক

যে মাকড়ষার জালে মাছির ন্যায় বাস করিতেছি, এখানে স্বতামত নামক আস্মানগামী ডানা দুটো খোলসা আছে বটে কিন্তু দুটা পা জড়াইয়া গেছে। ডানা আস্ফালন যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু উড়িবার কোন সুবিধা হইতেছে না। এখানে ডানা দুটো কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়াছে।

যেটা ভাল বলিয়া জানিলাম সেটা ভাল রকম হইয়া উঠে না—জ্ঞানের উপর বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে যে কাজ আরম্ভ করিলাম পদে পদে তাহার উল্টা উৎপত্তি হইতে লাগিল, সে কাজে আর গা লাগে না।

আমাদের সমাজ যে উত্তরোত্তর জটিল সমস্যা হইয়া উঠিতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কেহ বলিতেছে বিধবাবিবাহ ভাল কেহ বলিতেছে মন্দ, কেহ বলিতেছে বাল্য-বিবাহ উচিত কেহ বলিতেছে অনুচিত, কেহ বলে পরিবারের একান্নবর্ত্তিতা উঠিয়া গেলে দেশের মঙ্গল কেহ বলে অমঙ্গল। আসল কথা, ভাল কি মন্দ কোনটাই বলা যায় না—কোথাও বা ভাল কোথাও বা মন্দ।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ যে এতটা ঘোলাইয়া গিয়াছে তাহার গুরুতর কারণ আছে। প্রাচীনকালে স্ত্রী পুরুষ বা সমাজের উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ন্যূনাধিক্য ছিল বটে কিন্তু শিক্ষার সাম্যও ছিল। সকলেরই বিশ্বাস, লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, রুচি ও ভাব এক প্রকারের ছিল। সমাজ-সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের উঁচু-নীচু অবশ্যই ছিল কিন্তু তেলে জলের মত একটা পদার্থ ছিল না। পরস্পরের মধ্যে যে বিভিন্নতা ছিল তাহার ভিতরেও জাতীয়ভাবের একটি ঐক্য ছিল, সুতরাং এরূপ সমাজে

জটিলতার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে সমাজ সবল ছিল কি দুর্ব্বল ছিল, সে কথা হইতেছে না, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য ছিল অর্থাৎ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল; কিন্তু এখন সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গেছে। সেই জন্য বাঁ কাণ এক কোণে ডান কাণ আর কোণে, তুমি মাথা নাড়িতে চাহিলে, তোমার দুই পায়ের দুই বুড় আঙ্গুল নড়িয়া উঠিল, এক করিতে আর হয়।

আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিজাতীয় প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে, উচ্চ নীচের মধ্যে, প্রাচীন নবীনের মধ্যে অর্থাৎ বাপে বেটায় এক প্রকার জাতিভেদ হইয়াছে! যেখানে জতিভেদ আছে অথচ নাই, সেখানে কোন কিছুর হিসাব ঠিক থাকে না। দুই বৃক্ষ দুই দিকে যদি মুখ করিয়া থাকে তাহাতে উদ্ভিদ্‌রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় না—কিন্তু যেখানে ডালের সঙ্গে গুঁড়ির, আগার সঙ্গে গোড়ার মিল হয় না সেখানে ফুলের প্রত্যাশা করিতে গেলে আকাশ-কুসুম পাওয়া যায় এবং ফলের প্রত্যাশা করিতে গেলে কদলীও মিলে না।

আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা হইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না, তাহা হইলে আঁঠিতে খোসাতে এত মনান্তর, মতান্তর, অবস্থান্তর থাকিত না। কিন্তু হিন্দু-সমাজের শাখা হইতে পাড়িয়া বঙ্গসমাজকে বল পূর্ব্বক পাকান হইতেছে। ইহার একটা আশু উপকার এই দেখা যায় অতি শীঘ্রই পাক ধরে, গাছে পাঁচ দিনে যাহা হয় এই উপায়ে একদিনেই তাহা হয়। বঙ্গসমাজেও তাহাই হইতেছে। বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরাজী সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা

দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশটুকুর সঙ্গে তাহার কিছুতেই বনিতেছে না। এরূপ ফলের মধ্যে সহজ নিয়ম আর খাটে না।

পুরুষদের মধ্যে ইংরাজিশিক্ষা ব্যাপ্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হয় নাই। শিক্ষার প্রভাবে পুরুষেরা স্থির করিয়াছেন বাল্য-বিবাহ দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক—ইহাতে সন্তান দুর্ব্বল হয়, অল্প বয়সে বহুপরিবারের ভারে সংসার সাগরের অশ্রুপূর্ণ লোনাজলে হাবুডুবু খাইতে হয় ইত্যাদি। এই শিক্ষার গুণে তাঁহারা আত্মসংযম পূর্ব্বক নিজের ও দেশের দূর মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিবার পক্ষে উপযোগী হন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এরূপ শিক্ষা পান নাই এবং অধিক বয়সে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুতও হন নাই। তাঁহারা অন্তঃপুরের পুরাতন প্রথার মধ্যে, ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের চিরন্তন উপহাস বিদ্রূপের মধ্যে, বিবাহ প্রভৃতি গৃহ-কর্ম্মের নানাবিধ আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আশৈশব লালিত পালিত হইয়াছেন। আপিষের অন্নের ন্যায় প্রত্যুষেই তাঁহাদিগকে খরতাপে চড়ান হইয়াছে, এবং ক্রমাগত গরম মসলা পড়িতেছে—চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দশ, বড় জোর সাড়ে দশের আগেই রীতি-মত 'ক'নে' পাকাইয়া তাঁহাদিগকে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের বাল্যবিবাহ আবশ্যক। কিন্তু পুরুষেরা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে মেয়েদের বর শীঘ্র জুটিবে না—তাঁহাদিগকে দায়ে পড়িয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া অধিক বয়স্ক পুরুষেরা নিতান্ত অল্প বয়স্ক কন্যাকে

বিবাহ করিতে সম্মতও হইবেন না। অথচ বহু দিন অপেক্ষা করিবার মত অবস্থা ও শিক্ষা নহে—বিশেষতঃ প্রাচীনারা কন্যার বিবাহে বিলম্ব দেখিয়া বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে রীতিমত আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে বলিবেন, স্ত্রীশিক্ষাও ত প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সে কি আর শিক্ষা? গোটা দুই ইংরাজি প্রাইমার গিলিয়া, এমন কি এণ্ট্রেন্সের পড়া পড়িয়াও কি কঠোর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের শক্তি জন্মে? শত শত বৎসরের পুরুষানুক্রমবাহী সংস্কারের উপরে মাথা তুলিয়া উঠা অল্প শিক্ষাও অল্প বলের কাজ নহে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া ও অন্তঃপুরের চিরন্তন আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হওয়া এখন অনেক দিনের কথা। অথচ বাল্যবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ আজই জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন কি করা যায়!

একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছি, অথচ বাল্যবিবাহ উঠাইতে চাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অধিকবয়স্ক নূতন লোক প্রবেশ করিতে পারে না। চরিত্রগঠনের পূর্ব্বেই উক্ত পরিবারের সহিত লিপ্ত হওয়া চাই, নতুবা সেই নূতন লোক অচর্ব্বিত কঠিন খাদ্যের ন্যায় পরিবারের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে।

এই যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া গেল, তেমনি আরেক শ্রেণীর আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ইংরাজি শিক্ষাসত্ত্বেও কেহ কেহ এমন বিবেচনা করেন যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। বিধবাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকার অপেক্ষা মহত্ত্ব

আর কি হইতে পারে? ইহাতে পরিবারের মধ্যে একটি পবিত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যখন আজন্মকালের শিক্ষা ও উদাহরণের প্রভাবে বঙ্গনারী স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিত—স্বামীকেই স্ত্রীলোকের চরম গতি, পরমমুক্তির কারণ বলিয়া জানিত, তখন বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করা স্বাভাবিক ছিল, এবং না করা দুষ্য ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা, সে উদাহরণ, সে ভাব চলিয়া যাইতেছে, তবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কিসের বলে দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া কেবল একটা বাহ্য অনুষ্ঠান পালন করার কোন ফল নাই, তাহার আভ্যন্তরিক ভাবেই তাহার মহত্ব। এককালে আমাদের সমাজ ভক্তি ও স্নেহের সূত্রেই গাঁথা ছিল। তখন পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ছোট ভাই বড় ভাইকে, সমস্ত স্নেহাস্পদেরা সমস্ত গুরুজনদের অসীম ভক্তি করিত। সমাজের সে অবস্থায় স্ত্রীও স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিত। সমাজের সমস্ত সুর এক হইয়া মিলিত। এখন স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ কতকটা একাকার হইয়া পড়িতেছে। এখন বড় ভাইকে ছোট ভাই, গুরুজনদিগকে স্নেহাস্পদেরা, এমন কি, পিতাকে পুত্র তেমন ভাবে দেখে না, তেমন করিয়া মানে না—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সংক্রামক ভাব যদি সমাজের সর্ব্বত্রই আক্রমণ করিয়া থাকে তবে কি কেবল পতি-পত্নীর সম্পর্কই ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে? তাহাদের মধ্যেও কি সাম্যভাব প্রবেশ করে নাই, অথবা দ্রুতবেগে করিতেছে না? চারিদিকের উদাহরণে এই ভক্তির ভাব কি মন হইতে শিথিল হইয়া যায় নাই? আগে-

কার বউরা শাশুড়িকে যেরূপ মান্য করিত, এখনকার বউরা কি তেমন মান্য করে? শাশুড়ির প্রতি যে কারণে ভক্তির লাঘব হইয়াছে সেই কারণেই কি স্বামীর প্রতিও ভক্তির লাঘব হয় নাই? তবে কিরূপে আশা করা যায় পূর্ব্বে যেরূপ অচলা নিষ্ঠার সহিত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন, এখনও তাঁহারা সেইরূপ পারিবেন? এখন বলপূর্ব্বক সেই বাহ্য অনুষ্ঠান অবলম্বন করাইলে কি সমাজে উত্তরোত্তর গুরুতর অধর্ম্মাচরণ প্রবেশ করিয়া নিদারুণ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিবে না?

বিধবা-বিবাহের সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। আমাদের সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূল শিথিল হইয়া আসিতেছে। গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি ও আত্মমতবিসর্জ্জনই একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠাস্থল। এখন সাম্যনীতি সমাজে বন্যার মত আসিয়াছে, কোঠা বাড়ি হইতে কঞ্চির বেড়া পর্য্যন্ত উঁচু জিনিষ যাহা কিছু আছে সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া শিক্ষাও যত বাড়িতেছে, মতভেদও তত বাড়িতেছে। দুই সহোদর ভ্রাতার জীবন-যাত্রার প্রণালী ও মতে মিলে না, তবে আর বেশী দিন একত্র থাকা সম্ভবে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া গেলে স্বামীর মৃত্যুর পর একাকিনী বিধবা কাহাকে আশ্রয় করিবে? বিশেষতঃ তাহার যদি ছোট ছোট দুই একটি ছেলে থাকে তবে তাহাদের পড়ান শুনান রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে? আজ কাল যেরূপ অবস্থা ও সমাজ যে দিকে যাইতেছে, তাহারই উপযোগী পরিবর্ত্তন ও শিক্ষা হওয়া কি উচিত নয়?

কিন্তু যতদিন একান্নবর্ত্তিত্ব একেবারে না ভাঙ্গিয়া যায় তত দিনই বা বিধবাবিবাহ সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে কি করিয়া? স্বামী ব্যতীত শ্বশুরালয়ের আর কাহারও সহিত যাহার তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, সে রমণী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ের সহিত একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি দেখি না। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারে শ্বশুরালয়ে স্বামী ছাড়াও কত শত বন্ধন। অতএব স্বামীর মৃত্যুতেই শ্বশুরালয় হইতে ধর্ম্মতঃ মুক্তি লাভ করা যায় না। এত দিন যাহাদের সহিত রোগে শোকে বিপদে উৎসবে অনুষ্ঠানে সুখ দুঃখের আদান প্রদান চলিয়া আসিয়াছে, যাহাদের গৌরব ও কলঙ্ক তোমার নিকট কিছুই গোপন নাই, যেখানকার শিশুরা তোমার স্নেহের উপরে নির্ভর করে, সমবয়স্কেরা তোমার মমতা ও সান্ত্বনার উপর নির্ভর করে, গুরুজনেরা তোমার সেবার উপর নির্ভর করে, সেখান হইতে তুমি কোনক্রমে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। তাহা হইলে ধর্ম্ম থাকে না, পরিবারে সুখশান্তি থাকে না। সমাজের ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ বিধবার যদি সন্তান থাকে, তাহাদিগকে এক বংশ হইতে আর এক বংশে লইয়া গেলে পরিবারে অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত হয়, যদি না লইয়া যাওয়া হয় তবে সন্তানেরা মাতৃহীন হইয়া থাকে।

ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকের এমন মত আছে, যে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরের বাহির করা উচিত হয় না, তাহাতে তাঁহাদের অন্তঃপুরসুলভ কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এ কথার সত্যমিথ্যা গুণাগুণ লইয়া আমি বিচার করিতে বসি নাই। পূর্ব্বেই এক প্রকার বলিয়াছি

সমাজের বর্ত্তমান বিপ্লবের অবস্থায় কোন্ কাজটা সমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী কোন্‌টা নয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

বঙ্গনারীদের মুখপদ্ম যদি দুর্ভাগা সূর্য্যের তৃষিত নেত্রপথের অন্তরাল করাই অভিপ্রেত হয়, তবে, বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে তাহার কতকগুলি বাধা পড়িয়াছে, আমি তাহাই দেখিতে চাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে। প্রাচীন কালে দেশ বিদেশে যাতায়াতের তেমন সুবিধা ছিল না—ব্যয় অধিক এবং পথে বিপদও অনেক ছিল। এই জন্য তখনকার রীতি ছিল "পথে নারী বিবর্জ্জিতা।" এই জন্য পুরাকালের পথিকগণের বধূজন-বিলাপে কাব্য প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রেলের প্রসাদে পথ সুগম হইয়াছে, পথে বিপদও নাই। দেশে বিদেশে বাঙ্গালীদের কাজ কর্ম্ম হইতেছে। যখন পথ সুগম, ব্যয় অল্প, কোন বিপদ নাই, তখন স্ত্রী-পুত্রের বিরহ কাহারও সহ্য হয় না। কিন্তু রেলের এক একটি গাড়ি একলা অধিকার করিতে পারেন এমন সঙ্গতিও অল্প লোকের আছে। এই জন্য আজকাল প্রায় দেখা যায় পরপুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া অনেক ভদ্রলোকের পরিবার রেল-গাড়িতে যাত্রা করিতেছেন। উত্তরোত্তর এরূপ উদাহরণ আরও বাড়িতে থাকিবে। ইহা নিবারণ করা অসাধ্য। নিয়মের গ্রন্থি দুই চারিবার খুলিয়া ফেলিলেই তাহা শিথিল হইয়া যায়। বিশেষতঃ অনভ্যাসের সঙ্কোচ যত গুরুতর, নিয়মের আঁটাআঁটি তত গুরুতর নহে। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার অনভ্যাস যদি অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে সমাজ-নিয়মের বাধা আর বড় কাজে লাগে না। আর একটা দেখিতে

হয়—পূর্ব্বে অবরোধপ্রথা সর্ব্ববাদীসম্মত ছিল, সুতরাং তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন কেহ বা বাহিরে যান কেহ বা যান না। যাঁহারা না যান তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে নানা গল্প শুনিতে পান, নানা উদাহরণ দেখিতে পান। সুতরাং স্বভাবতঃই বাহিরে যাওয়া মাত্রই তাঁহাদের তেমন বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয় না, এমন কি বাহিরে যাইতে অনেক কারণে তাঁহাদের কৌতূহলও জন্মে। কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবারকার একজিবিশনে যত পুরনারী সমাগম হইয়াছিল, বিশবৎসর পূর্ব্বে ইহার সিকি হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। সমাজের পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রভাবে সেই যদি মেয়েরা বাহির হইতেছেন, তবে মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভান করা বৃথা। ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত না হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েরা সেই বাহির হইবে—তবে অপ্রস্তুত ভাবে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। অনেক ভদ্র পুরনারী রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রকাশ্যস্থানে যাত্রা করেন, অথচ তাঁহাদের বেশভূষা অতিশয় লজ্জাজনক। অন্তঃপুরের প্রাচীর যখন আবরণের কাজ করে তখন যাহা হয় একটা বস্ত্র পরার উপলক্ষ্য রক্ষা কর আর না কর, সে তোমার রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহির হইতে হইলে সমাজের মুখ চাহিয়া লজ্জারক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—রীতি-মত ভদ্রবেশ পরিতে হইবে। পুরুষদের পরিতে হইবে অথচ মেয়েদের পরিতে হইবে না, ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখে? ভদ্র পুরুষরা যখন জামা না পরিয়া বাহির হইতে বা ভদ্রসমাজে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, তখন ভদ্র স্ত্রীরা কি করিয়া শুদ্ধমাত্র একখানি বহু যত্নে সম্বরণীয় সূক্ষ্ম সাড়ি পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইবেন! আজকাল এরূপ রীতিগর্হিত ব্যাপার যে

ঘটিতেছে, তাহার কারণ অভিভাবকদের এ বিষয়ে মতের স্থৈর্য্য নাই একটা হিজিবিজি কাণ্ড হইতেছে। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনা তাঁহাদের মতও নয়, অথচ আনিতেও হইবে—এই জন্য অত্যন্ত অশোভনভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। গৃহের স্ত্রীলোক-দিগকে সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ ভাবে বাহির করিলে তাঁহাদের অপমান করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবাসীদের উপহাস বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া পুরস্ত্রীদিগকে যদি ভদ্রবেশ পরান' অভ্যাস করাও, তবে তাঁহা-দিগকে বাহিরে আনিতে পার—নতুবা উচক্কা মত বা উপস্থিত সুবিধার খাতিরে এরূপ ভদ্রজননিন্দনীয় ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিলে সমস্ত ভদ্র বঙ্গসমাজকে বিষম লজ্জায় ফেলা হয়।

এক দল লোক আছেন তাঁহারা আধাআধি রকম সমাজ সংস্কার করিতে চান। "একচোখো সংস্কার" নামক প্রবন্ধে তাঁহাদের সংস্কার কার্য্যের বিষয়ে বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছি। স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনরায় বিবাহ করিলে পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, এ বিষয়ে অনেকের সংশয় নাই। কিন্তু পৃথিবীর সুখ হইতে বিধবা-দিগকে বঞ্চিত করা তাঁহারা নিষ্ঠুরতা জ্ঞান করেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় বিধবাদিগকে পৃথিবীর সুখে মগ্ন করিয়া রাখাই প্রকৃত নিষ্ঠুরতা। অতএব একটাকে ছাড়িয়া আর একটা রাখিতে গেলে ঘাড়কে ছাঁটিয়া মাথা রাখিতে গেলে বিশৃঙ্খলা উপ-স্থিত হয়। একটি উদাহরণ দিলাম, কিন্তু এমন অনেক বিষয়েই প্রাচীন সমাজ নিয়মের সহিত রকা করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিতে গিয়া সমাজের নানাদিকে জটিলতা আরও বাড়িয়া উঠিতেছে।

এমন জটিল সমস্যার মধ্যে বাস করিয়া সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা অন্ধ গোঁড়ামির কার্য্য। যদি কোন সম্প্রদায় এমন আইন জারি করেন, তাঁহাদের দলের সমুদয় লোককেই অবস্থা নির্ব্বিচারে বাল্য-বিবাহ পরিহার করিতেই হইবে, বিধবা-বিবাহ দিতেই হইবে, অবরোধ-প্রথা ভাঙ্গিতেই হইবে. তবে তাহাতে সমাজের অপকার হইতে পারে। মূল ধর্ম্মনীতি সমূহের ন্যায় সমাজ-নীতি সকল অবস্থায় সকল লোকের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে। পরিবার বিশেষে বাল্য-বিবাহ উঠিয়া গেলেও হানি নাই, কিন্তু সকল পরিবারেই একথা খাটে না। পরিবার-বিশেষে বিধবাবিবাহ হইবার সুবিধা আছে, কিন্তু সকল পরিবারে নাই। স্ত্রী-বিশেষ স্বাধীনতার উপযোগী কিন্তু সকল স্ত্রী নহে। যাঁহারা বলপূর্ব্বক সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিতে চান, তাঁহারা যতই স্ফীত হউন না কেন, তাঁহাদিগকে সমাজের গাত্রে একটি সুমহৎ ক্ষত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সকল অবস্থাতেই আইন পূর্ব্বক বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে। অবস্থানির্ব্বিচারে বিবাহার্থিনী বিধবা মাত্রেই বিবাহ দিতে গেলে অস্বাস্থ্য-জনক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। স্ত্রী মাত্রেরই স্বাধীনতা দিতে গেলেই বঙ্গীয়-সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়। তেমনি আবার বাল্যবিবাহই একমাত্র নিয়ম বলিয়া অবলম্বন করা, সকল অবস্থাতেই সকল বিধবার স্কন্ধেই বলপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য বোঝা চাপাইয়া দেওয়া এবং স্ত্রীলোকদিগকে কোনমতেই এবং কোনকালেই অন্তঃপুরের বাহিরে আনিবার চেষ্টা না করা অত্যন্ত অন্ধপ্রথানুবর্ত্তিতার পরিচায়ক। অতএব এই সকল সমস্যার প্রতি

মনোযোগ করিয়া এক প্রকার গোঁয়ার্ত্তমি গোঁড়ামি পরিত্যাগ কর। শান্ত সংযতভাবে সমাজ সংস্কারের প্রতি মন দাও। অথচ বাঁধন ছিঁড়িবার উপলক্ষে তুচ্ছতর সাম্প্রদায়িক বাঁধনে সমাজের পঙ্গুদেহ জড়াইও না।

এক-চোখো সংস্কার।

সংস্করণের অর্থ স্বাধীনতা উপার্জ্জন। বাল্যাবস্থায় সমাজের শত সহস্র বন্ধন থাকে, শত সহস্র অনুশাসনে তাহাকে সংযত করিয়া রাখিতে হয়। সে সময়ে তাহার দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য স্ফূর্ত্তিকে দমন করিয়া রাখাই তাহার কল্যাণের হেতু। অবশেষে সে যখন বড় হইতে থাকে, তখন একে একে সে এক একটি বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়, শাস্ত্রের এক একটি কঠোর আদেশ কণ্ঠ হইতে অবতারণ করিতে চায়, লোকাচারের এক একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের তলে তলে গোপনে ছিদ্র করিয়া দেয় ও অবশেষে একদিন প্রকাশ্যে বারুদ লাগাইয়া সমস্তটা উড়াইয়া দেয়। ইহাকেই বলে সংস্করণ। তাই বলিতেছি সংস্করণের নাম স্বাধীনতার প্রয়াস। গুটিপোকা যখন প্রজাপতি হইয়া তাহার রেশমের কারাগার ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন সে সংস্কার করে। মাকড্‌সা যখন আপনার রচিত জালে জড়াইয়া পড়িয়া মুক্ত হইবার জন্য যুঝিতে থাকে তখন সে এক জন সংস্কারক। দুর্ভাগ্যক্রমে মনুষ্য-সমাজ-সংস্কার সাপের খোলোষ ছাড়ার মত একটা সহজ ব্যাপার নহে। খোলোষের প্রতি এত মায়া মনুষ্য-সমাজ ব্যতীত আর কাহারো নাই।

সন্তানকে শাসন করা, সন্তানকে পালন করা তাহার শিশু-অবস্থার

উপযোগী; কিন্তু সে অবস্থা অতীত হইলেও অনেক পিতা মাতা তাহাদিগকে শাসন করেন, তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক পালন করেন, তাহাদিগকে যথোপযোগী স্বাধীনতা দেন না। সন্তানের বর্ষে বর্ষে পরিবর্ত্তন আছে, অথচ পিতা মাতার কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তন নাই। ইহার ফল হয় এই যে, একদিন সহসা তাঁহারা দেখিলেন, সন্তান তাঁহাদের একটি আদেশ শুনিল না। মাঝে মাঝে এক একটা বিষয়ে তাঁহাদের অবাধ্যতা করিতে লাগিল। তাঁহাদের কখন এরূপ অভ্যাস ছিল না; বরাবর তাঁহাদের আদেশ পালিত হইয়া আসিতেছে, আজ সহসা তাহার অন্যথা দেখিয়া তাঁহাদের গায়ে সহ্য হয় না। উভয় পক্ষে একটা সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। ইহাকেই বলে বিপ্লব। অবশেষে একে একে সে পিতা মাতার একটি একটি শাসন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে থাকে, তাহার স্বাধীনতার সীমা পদে পদে বৃদ্ধি করিতে থাকে ও অবশেষে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, ইহাকেই বলে সংস্কার। বৃদ্ধ লোকেরা আক্ষেপ করিতে থাকেন যে, সন্তানদের অবনতি হইল; স্বাধীনতাই লাভ করুক্, আর আত্ম-নির্ভরই শিখুক, আর আলস্যই পরিহার করুক, যখন্ গুরুজনের অবাধ্য হইল তখন আর তাহাদের শ্রেয়ঃ কোথায়? অবাধ্য না হইলেই ভাল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সংসারে যদি কোন মঙ্গল না যুঝিয়া না পাওয়া যায়, সকলি যদি কাড়িয়া লইতে হয়, কিছুই যদি চাহিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবাধ্য না হইয়া আর গতি কোথায়?

উপরের কথাটা আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক। পৃথিবীতে কিছুই সর্ব্বতোভাবে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বলিতে

গেলে অধীনতা মাত্রই অশুভ, স্বাধীনতা মাত্রই শুভ। মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা যাহাতে যথাসম্ভব স্বাধীনতা পায়। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব। পৃথিবীতে যথাসম্ভব স্বাধীনতা পাইতে গেলেই নিজেকে অধীন করিতে হয়। দুর্ব্বলপদ বৃদ্ধ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিলে যষ্টির অধীনতা স্বীকার করেন। তেমনি রাজার (Government) অধীনে না থাকিলে প্রজার স্বাধীনতা রক্ষা হয় না, আবার প্রজার অধীনে না থাকিলে রাজাও অধিক দিন স্বাধীনতা রাখিতে পারেন না। আমরা যথাসম্ভব স্বাধীন হইবার অভিপ্রায়ে সমাজের শত সহস্র নিয়মের অধীনতা স্বীকার করি। যে ব্যক্তি সমাজের প্রত্যেক নিয়ম দাসভাবে পালন করে, আমরা তাহাকে প্রশংসা করি ; যে তাহার একটি নিয়ম উচ্ছেদ করে, আমরা তাহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হই। এইরূপে অধীনতাকে আমরা পূজা করি। এবং সাধারণ লোকে মনে করে যে অধীনতা পূজনীয় কেননা সে অধীনতা ; রাজার প্রতি অন্ধ-নির্ভর পূজনীয় কেননা তাহা রাজ-ভক্তি ; সমাজের নিয়ম পালন পূজনীয়, কেননা তাহা সমাজের নিয়ম। কিন্তু তাহা ত নয়। অসম্পূর্ণ পৃথিবীতে অধীনতা স্বাধীনতার সোপান বলিয়াই তাহার যা' গৌরব। সে কার্য্যের যখনি সে অনুপযোগী ও প্রতিরোধী হইবে তখনি তাহাকে পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। আমাদের এমনি কপাল, যে, কণ্টক বিঁধাইয়া কণ্টককে উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া উদ্ধার হইয়া গেলেও যে অপর কণ্টকটিকে কৃতজ্ঞতার সহিত ক্ষতস্থানে বিঁধাইয়া রাখিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন স্বাধীনতা রক্ষার

জন্য রাজ-শাসনের আবশ্যক থাকিবে না বরঞ্চ বিপরীত হইবে, তথন রাজাকে দূর কর, রাজভক্তি বিসর্জ্জন কর। যথন সমাজের কোন নিয়ম আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সাহায্য না করিবে, তথন নিয়ম রক্ষার জন্য যে, সে নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে। তাহা যদি করিতে হয়, তবে এক অধীনতার হস্ত হইতে দ্বিতীয় অধীনতার হস্তে পড়িতে হয়। অসহায় স্যাক্সনেরা যেমন শক্র-অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, প্রবলতর শক্রকে আহ্বান করিয়াছিল, স্বাধীনতা পাইবার জন্য অস্তিত্ব প্রবল করিবার জন্য, স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব উভয়ই বিসর্জ্জন দিয়াছিল, সমাজেরও ঠিক তাহাই হয়। ইহাই সংস্কারের গোড়ার কথা।

এক দল লোক বিলাপ করিবেই। বোধ করি এমন কাল কোন কালে ছিল না, যথন এক দল লোক স্মৃতি-বিস্মৃতি-বিজড়িত কুহেলিকাময় অতীত কালের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়াছে ও বর্ত্তমান কালের মধ্যে সর্ব্বনাশের, প্রলয়ের, বীজ না দেখিয়াছে। সত্য যুগ কোন কালে বর্ত্তমান ছিল না, চিরকাল অতীত ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি কি হইতে ইচ্ছা করেন? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি!" ভবিষ্যৎ তাঁহার চক্ষে এমন লোভনীয় বলিয়া ঠেকিয়াছিল! কিন্তু কত শত সহস্র লোক আছেন, তাঁহাদের উক্ত প্রশ্ন করিলে উত্তর করেন, "আমি আমার পিতামহ হইতে ইচ্ছা করি!" ইহাঁদের পৌত্রেরাও আবার ঠিক তাহাই ইচ্ছা করিবে। ইহাঁদের পিতামহেরাও তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

এক দল লোক আছেন, তাঁহারা পরিবর্ত্তন মাত্রেরই বিরোধী নহেন। তাঁহারা আংশিক পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাঁহাদের বিষয় লেখাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাঁহারা বলেন, বিধবা-বিবাহে আমাদের মত নাই; তবে, সংস্কার করিতে হয় ত বিধবাদের অবস্থা-সংস্কার কর। তাহাদের উপবাস করিতে না হয়, তাহাদের মৎস্য মাংস খাইতে নিষেধ না থাকে, বেশ বিন্যাস বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছাকে অন্যায় বাধা না দেওয়া হয়। এক কথায়, বিধবাদের প্রতি সমাজের যত প্রকার অত্যাচার আছে, তাহা দূর হউক্, কিন্তু তাহাই বলিয়া বিধবারা সধবা হইতে পারিবে না। তাঁহারা বলিবেন;—"অসবর্ণ বিবাহ! কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু অনুরাগ-মূলক বিবাহে আমাদের আপত্তি নাই। পিতামাতাদের দ্বারা বধূ নির্ব্বাচিত না হইয়া প্রণয়াকৃষ্ট বিবাহেচ্ছুক যদি স্বয়ং আপনার উপযোগী পাত্রী স্থির করে ত ভাল হয়। কিন্তু অসবর্ণ-বিবাহ নৈব নৈবচ।" তাঁহারা পুত্রের বয়স অধিক না হইলে বিবাহ দিতে অনুমতি করেন না, কিন্তু কন্যাকে অল্প বয়সে বিবাহ দেন। তাঁহারা স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতাকে ডরান। লোকাচার বিশেষের উপর তাঁহাদের বিরাগ নাই, তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটা অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের আক্রোশ। তাঁহারা বুঝেন না যে, সেই অনুষ্ঠান গুলি সেই লোকাচারের স্তম্ভ। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই;—"সমস্ত বৃক্ষটির উপর আমাদের বিদ্বেষ নাই; কিন্তু উহার কতকগুলা জটিল শিকড় যত অনর্থের মূল আমরা শুদ্ধ কেবল ঐ শিকড়গুলা ছেদন করিব। আহা, গাছটি বাঁচিয়া থাক্!"

যদি তুমি বিধবা-বিবাহ দিতে প্রস্তুত না থাক,' তবে বিধবারা যেমন আছে তেমনি থাক্। সমাজ যে, বিধবাদের উপবাস করিতে বলে, মাছ মাংস খাইতে, বেশভূষা করিতে নিষেধ করে, তাহার কারণ সমাজের খাম-খেয়ালী অত্যাচার-স্পৃহা নহে। সমাজ বিধবা-দিগকে বিধবা রাখিবার জন্যই এই কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াছে। যদি তুমি চির-বৈধব্য ব্রত ভালবাস,' তবে আর এ সম্বন্ধে কথা কহিও না। তুমি মনে করিতেছ ঐ বাঁকাচোরা শিকড়গুলা গাছের কতকগুলা অর্থহীন গলগ্রহ মাত্র; তাহা নয়,—উহারাই আশ্রয়, উহারাই প্রাণ। যদি অসবর্ণ বিবাহে তোমার আপত্তি থাকে, তবে পূর্ব্বরাগ-মূলক বিবাহকে খবরদার প্রশ্রয় দিও না। ইহা সকলেই জানেন, অনুরাগের হিসাব কিতাবের জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। সে, ঘর বুঝিয়া, দর করিয়া, গোত্র জানিয়া পাত্রবিশেষকে আশ্রয় করে না। তাহার নিকট রাঢ় বারেন্দ্র নাই; গোত্র প্রভেদ নাই; ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই। অতএব অনুরাগের উপর বিবাহের ঘটকালী ভার অর্পণ করিলে সে জাতি বিজাতিকে একত্র করিবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব, হয়, অসবর্ণ বিবাহ দেও, নয়, পিতামাতার প্রতি সন্তানের বিবাহ ভার থাক্। কিন্তু এই পরাধীন বিবাহ প্রথা রক্ষা করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার আরো অনেক গুলি অনুষঙ্গিক প্রথা রক্ষা করিতে হয়। যেমন বাল্য-বিবাহ ও অবরোধ প্রথা। যদি স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরের বহির্দ্দেশে বিচরণ করিতে পায়, ও অধিক বয়সে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়, তবে অসবর্ণ বিবাহ আরম্ভ হইবেই। যখন যৌবনকালে কুমার কুমারী-যুগলের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবে, তখন কি পিতামাতার ও

চিরন্তন প্রথার নীরস আদেশ তাহারা মান্য করিবে? তাহা ব্যতীতও বাল্যবিবাহের আর একটি অর্থ আছে। বালক কাল হইতে দম্পতির একত্রে বর্দ্ধন, একত্রে অবস্থান হইলে, উভয়ে এক রকম মিশ খাইয়া যায়, বনিয়া যায়। কিন্তু যখন পাত্র ও পাত্রী উভয়ে বয়স্ক, উভয়েরই যখন চরিত্র সংগঠিত ও মতামত স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে ও কচি অবস্থার নমনীয়তা চলিয়া গিয়াছে ও পাকা-অবস্থার দৃঢ়তা জন্মিয়াছে, তখন অমন দুই ব্যক্তিকে অনুরাগ ব্যতীত আর কিছুতেই জুড়িতে পারে না;—না, বাস-সামীপ্য, না বিবাহের মন্ত্র। তাহাদের যতই বলপূর্ব্বক একত্র করিতে চেষ্টা করিবে, ততই তাহারা দ্বিগুণ বলে তফাৎ হইতে থাকিবে। অনুরাগ করা তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই অনুরাগ করা তাহাদের পক্ষে দ্বিগুণ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। অতএব যদি অসবর্ণ বিবাহ না দেও, তবে পূর্ব্বরাগ-মূলক বিবাহ দিও না, বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাক্, অবরোধ-প্রথা উঠাইও না। তুমি যে মনে করিতেছ, সুবিধামত আমি সমাজ হইতে লোকাচারের একটি মাত্র ইট খসাইয়া লইব, আর অধিক নয়; তোমার কি ভ্রম! ঐ একটি ইঁট খসিলে কতগুলি ইঁট খসিবে ও প্রাচীরে কতখানি ছিদ্র হইবে তাহা তুমি জান না।

অতএব দেখা যাইতেছে, দুই দল লোক সমাজ সংস্কার করে। এক, যাহারা লোকাচারকে একেবারে মূল হইতে উৎপাটন করে, আর যাহা লোকাচারের একটি একটি করিয়া শিকড় কাটিয়া দেয় ও অবশেষে কপালে করাঘাত করিয়া বলে, "এ কি হইল! গাছ শুকাইল

কেন ?” ইহাদের উভয়েরই আবশ্যক। প্রথম দল যখন কোন একটা লোকাচার আমূলতঃ বিনাশ করিতে চায়, তখন সমাজ কোমর বাঁধিয়া রুখিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাই বলিয়া যে, সংস্কারকদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হয় তাহা নহে। তাহার একটা ফল থাকিয়া যায়। মনে কর যেখানে অবরোধপ্রথা একেবারে তুচ্ছ করিয়া পাঁচজন সংস্কারক তাঁহাদের পত্নীদিগকে গাড়ি চড়াইয়া রাস্তা দিয়া লইয়া যান, সেখানে দশজন স্ত্রীলোক পাল্কী চড়িয়া যাইবার সময় দরজা খুলিয়া রাখিলেও তাঁহাদের কেহ নিন্দা করে না। কেবল মাত্র যে তাঁহাদের নিন্দা করে না, তাহা নহে; তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া সকলে বলাবলি করে, “হাঁ, এ ত বেশ! ইহাতে ত আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মেয়ে মানুষে গাড়ী চড়িবে সে কি ভয়ানক!” আপত্তি যে নাই, তাহার কারণ, আর পাঁচ জন গাড়ি চড়ে। নহিলে বিষম আপত্তি হইত। সমাজ যখন দেখে, দশ জন লোক হোটেলে গিয়া খানা খাইতেছে, তখন যে বিশ জন লোক ব্রাহ্মণকে দিয়া মুরগী রাঁধাইয়া খায়, তাহাদিগকে দ্বিগুণ আদরে বুকে তুলিয়া লয়। ইহাই দেখিয়া অদূরদর্শী-গণ আমূল-সংস্কারকদিগকে বলিয়া থাকে, “দেখ দেখি, তোমরাও যদি এইরূপ অল্পে অল্পে আরম্ভ করিতে সমাজ তোমাদেরও কোন নিন্দা করিত না।”

এককালে যে লোকাচারের প্রাচীরটি আশ্রয় স্বরূপ ছিল, আর এক কালে তাহাই কারাগার হইয়া দাঁড়ায়। এক দল কামান লইয়া বলে, ভাঙ্গিয়া ফেলিব; আর এক দল রাজমিস্ত্রির যন্ত্রাদি আনিয়া বলে, না, ভাঙ্গিয়া কাজ নাই, গোটাকতক খিড়্‌কির দরজা তৈরি করা যাক্।

অমনি সমাজ হাঁপ ছাড়িয়া বলে, হাঁ, এ বেশ কথা। এই রূপে আমাদের অসংখ্য লোকাচারের প্রাচীরে খিড়্‌কির দরজা বসিয়াছে। প্রত্যহ একটি একটি করিয়া বাড়িতেছে; অবশেষে যখন দেখিবে, তাহার নিয়মসমূহে এত খিড়্‌কির দরজা হইয়াছে যে, তাহার প্রাচীরত্ব আর রক্ষা হয় না, তখন সমস্তটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আর আপত্তি করিবে না, এমন কি, তখন ভাঙ্গিয়া ফেলাও আর আবশ্যক হইবে না। এইরূপে এক-চোখো সংস্কারকগণ নিজের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যতটা সমাজ সংস্কার করেন, এমন অল্প সংস্কারকই করিয়া থাকেন। ইঁহারা রক্ষণশীল দল-ভুক্ত হইয়াও উৎপাটনশীলদিগকে সাহায্য করেন।

একটি পুরাতন কথা।

অনেকেই বলেন, বাঙ্গালীরা ভাবের লোক, কাজের লোক নহে। এই জন্য তাঁহারা বাঙ্গালীদিগকে পরামর্শ দেন Practical হও। ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করিলাম। কারণ, ঐ কথাটাই চলিত। শব্দটা শুনিলেই সকলে বলিবেন, হাঁ হাঁ, বটে, এই কথাটাই বলা হইয়া থাকে বটে। আমি তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে গিয়া অনর্থক দায়িক হইতে যাইব কেন? যাহা হউক্ তাঁহাদের যদি জিজ্ঞাসা করি, Practical হওয়া কাহাকে বলে, তাঁহারা উত্তর দেন,—ভাবিয়া চিন্তিয়া ফলাফল বিবেচনা করিয়া কাজ করা, সাবধান হইয়া চলা, মোটা মোটা উন্নত ভাবের প্রতি বেশী আস্থা না রাখা, অর্থাৎ ভাবগুলিকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লওয়া। খাঁটি সোনায় যেমন ভাল মজবুত গহনা গড়ান' যায় না, তাহাতে মিশাল দিতে হয়, তেমনি খাঁটি ভাব লইয়া সংসারের কাজ চলে না তাহাতে খাদ মিশাইতে হয়। যাহারা বলে সত্য কথা বলিতেই হইবে, তাহারা Sentimental লোক, কেতাব পড়িয়া তাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, আর যাহারা আবশ্যকমত দুই একটা মিথ্যা কথা বলে ও সেই সামান্য উপায়ে সহজে কার্য্য-সাধন করিয়া লয় তাহারা Practical লোক।

এই যদি কথাটা হয়, তবে বাঙ্গালীদিগকে ইহার জন্য অধিক সাধনা করিতে হইবে না। সাবধানী ভীরু লোকের স্বভাবই এই-রূপ। এই স্বভাববশতই বাঙ্গালীরা চাকরী করিতে পারে কিন্তু কাজ চালাইতে পারে না।

উল্লিখিত শ্রেণীর Practical লোক ও প্রেমিক লোক এক নয়। Practical লোক দেখে ফল কি,—প্রেমিক তাহা দেখে না এই নিমিত্ত সেইই ফল পায়। জ্ঞানকে যে ভালবাসিয়া চর্চ্চা করিয়াছে সেই জ্ঞানের ফল পাইয়াছে; হিসাব করিয়া যে চর্চ্চা করে তাহার ভরসা এত কম যে, যে শাখাগ্রে জ্ঞানের ফল সেখানে সে উঠিতে পারে না; সে অতি সাবধান সহকারে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ফল পাইতে চায়—কিন্তু ইহারা প্রায়ই বেঁটে লোক হয়—সুতরাং "প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" হইয়া পড়ে।

বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সঙ্কুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়। এই জন্য বয়স হইলে সংসারের উপর হইতে বিশ্বাস হ্রাস হইলে পর তবে সাবধানিতা বিজ্ঞতা আসিয়া পড়ে। এই অবিশ্বাসের আধিক্য-হেতু অধিক বয়সে কেহ একটা নূতন কাজে হাত দিতে পারে না, ভয় হয় পাছে কার্য্যসিদ্ধি না হয়—এই ভয় হয় না বলিয়া অল্প বয়সে অনেক কার্য্য হইয়া উঠে, এবং হয়ত অনেক কার্য্য অসিদ্ধও হয়।

মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ। যে মহাপুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি সংসারের কাজে গোঁজামিলন দিতে পারেন না। তিনি সামান্য সুবিধা অসুবিধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি আপনার জীবনের আদর্শকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে পারেন না—কর্ত্তব্যের সহস্র জায়গায় ফুটা করিয়া পালাইবার পথ নির্ম্মাণ করেন না। তিনি জানেন অনন্তকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সত্যই আছে, অনন্তকাল আছে অনন্তকাল থাকিবে, মিথ্যা আমার সৃষ্টি—আমি চোখ বুজিয়া সত্যের আলোক আমার নিকটে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না। অর্থাৎ ফাঁকি আমাকে দিতে পারি কিন্তু সত্যকে দিতে পারি না।

মানুষ পশুদের ন্যায় নিজে নিজের এক মাত্র সহায় নহে। মানুষ মানুষের সহায়। কিন্তু তাহাতেও তাহার চলে না। অনন্তের সহায়তা না পাইলে সে তাহার মনুষ্যত্বের সকল কার্য্য সাধন করিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবন রক্ষা করিতে হইলে নিজের উপরেই নির্ভর করিয়াও চলিয়া যাইতে পারে, স্বত্বরক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের সহায়তা আবশ্যক, আর প্রকৃত রূপ আত্মরক্ষা করিতে হইলে অনন্তের সহায়তার আবশ্যক করে। বলিষ্ঠ নির্ভীক স্বাধীন উদার আত্মা সুবিধা, কৌশল, আপাততঃ, প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্জ্জনার মধ্যে বাস করিতে পারে না। তেমন অস্বাস্থ্য-জনক স্থানে পড়িলে ক্রমে সে মলিন দুর্ব্বল রুগ্ন হইয়া পড়িবেই। সাংসারিক সুবিধা সকল তাহার চতুর্দ্দিকে বল্মীকের স্তূপের মত উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু

সে নিজে তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জীর্ণ হইতে থাকিবে।

বিবেচনা বিচার বুদ্ধির বল সামান্য। তাহা চতুর্দ্দিকে সংশয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহা সংসারের প্রতিকূলতায় শুকাইয়া যায়—অকূলের মধ্যে তাহা ধ্রুবতারার ন্যায় দীপ্তি পায় না। এই জন্যই বলি, সামান্য সুবিধা খুঁজিতে গিয়া মনুষ্যত্বের ধ্রুব উপাদান গুলির উপর বুদ্ধির তীক্ষ্ণমুখ ক্ষুদ্র কাঁচি চালনা করিও না। কলস যত বড়ই হউক্ না, সামান্য ফুটা হইলেই তাহার দ্বারা আর কোন কাজ পাওয়া যায় না। তখন যাহা তোমাকে ভাসাইয়া রাখে তাহা তোমাকে ডুবায়।

ধর্ম্মের বল নাকি অনন্তের নির্ঝর হইতে নিঃসৃত, এই জন্যই সে আপাততঃ অসুবিধা, সহস্রবার পরাভব, এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ডরায় না। ফলাফল লাভেই বুদ্ধি বিচারের সীমা, মৃত্যুতেই বুদ্ধি বিচারের সীমা—কিন্তু ধর্ম্মের সীমা কোথাও নাই।

অতএব এই অতি সামান্য বুদ্ধি বিবেচনা বিতর্ক হইতে কি একটি সমগ্র জাতি চির-দিনের জন্য পুরুষানুক্রমে বল পাইতে পারে! একটি মাত্র কূপে সমস্ত দেশের তৃষা নিবারণ হয় না। তাহাও আবার গ্রীষ্মের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। কিন্তু যেখানে চির-নিঃসৃত নদী প্রবাহিত সে-খানে যে কেবলমাত্র তৃষা-নিবারণের কারণ বর্ত্তমান তাহা নহে, সেখানে সেই নদী হইতে স্বাস্থ্যজনক বায়ু বহে,দেশের মলিনতা অবিশ্রাম ধৌত হইয়া যায়, ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ হয়, দেশের মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তেমনি বুদ্ধি-বলে কিছু দিনের জন্য সমাজ রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবলে চিরদিন সমাজের রক্ষা হয়, আবার

তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপে চতুর্দ্দিক হইতে সমাজের স্ফূর্ত্তি, সমাজের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য বিকাশ দেখা যায়। বদ্ধ-গুহায় বাস করিয়া আমি বুদ্ধিবলে রসায়নতত্ত্বের সাহায্যে কোন মতে অক্সিজেন গ্যাস নির্ম্মান করিয়া কিছু কাল প্রাণধারণ করিয়া থাকিতেও পারি—কিন্তু মুক্ত বায়ুতে যে চিরপ্রবাহিত প্রাণ, চিরপ্রবাহিত স্ফূর্ত্তি, চিরপ্রবাহিত স্বাস্থ্য ও আনন্দ আছে তাহা ত বুদ্ধিবলে গড়িয়া তুলিতে পারি না। সঙ্কীর্ণতা ও বৃহত্ত্বের মধ্যে যে কেবল মাত্র কম ও বেশী লইয়া প্রভেদ তাহা নহে, তাহার আনুষঙ্গিক ফলাফলের প্রভেদই গুরুতর।

ধর্ম্মের মধ্যে সেই অত্যন্ত বৃহত্ত্ব আছে—যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দূষিত করিতে পারে না। ধর্ম্ম অনন্ত আকাশের ন্যায়; কোটি কোটি মনুষ্য পশু পক্ষী হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত অবিশ্রাম নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আর যাহাই আশ্রয় কর না কেন, কালক্রমে তাহা দূষিত ও বিষাক্ত হইবেই। কোনটা বা অল্প দিনে হয়, কোনটা বা বেশী দিনে হয়।

এই জন্যই বলিতেছি—মনুষ্যত্বের যে বৃহত্তর আদর্শ আছে, তাহাকে যদি উপস্থিত আবশ্যকের অনুরোধে কোথাও কিছু সঙ্কীর্ণ করিয়া লও, তবে নিশ্চয়ই ত্বরায় হউক আর বিলম্বেই হউক, তাহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। সে আর তোমাকে বল ও স্বাস্থ্য দিতে পারিবে না। শুদ্ধ সত্যকে যদি বিকৃত সত্য, সঙ্কীর্ণ সত্য, আপাততঃ সুবিধার সত্য করিয়া তোল তবে উত্তরোত্তর নষ্ট হইয়া সে মিথ্যায় পরিণত হইবে, কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। কারণ,

অসীমের উপর সত্য দাঁড়াইয়া আছে, আমারই উপর নহে, তোমারই উপর নহে, অবস্থাবিশেষের উপর নহে—সেই সত্যকে সীমার উপর দাঁড় করাইলে তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি ভাঙ্গিয়া যায়—তখন বিসর্জ্জিত দেবপ্রতিমার তৃণকাষ্ঠের ন্যায় তাহাকে লইয়া যে-সে যথেচ্ছা টানা-হেঁচড়া করিতে পারে। সত্য যেমন অন্যান্য ধর্ম্মনীতিও তেমনি। যদি বিবেচনা কর পরার্থপরতা আবশ্যক, এই জন্যই তাহা শ্রদ্ধেয়; যদি মনে কর, আজ আমি অপরের সাহায্য করিলে কাল সে আমার সাহায্য করিবে, এই জন্যই পরের সাহায্য করিব—তবে কখনই পরের ভাল রূপ সাহায্য করিতে পার না, ও সেই পরার্থপরতার প্রবৃত্তি কখনই অধিক দিন টিঁকিবে না। কিসের বলেই বা টিঁকিবে! হিমালয়ের বিশাল হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে বলিয়াই গঙ্গা এত দিন অবিচ্ছেদে আছে, এতদূর অবাধে গিয়াছে, তাই সে এত গভীর এত প্রশস্ত; আর এই গঙ্গা যদি আমাদের পরম সুবিধা-জনক কলের পাইপ্ হইতে বাহির হইত তবে তাহা হইতে বড় জোর কলিকাতা সহরের ধূলাগুলা কাদা হইয়া উঠিত আর কিছু হইত না। গঙ্গার জলের হিসাব রাখিতে হয় না; কেহ যদি গ্রীষ্মকালে দুই কলসী অধিক তোলে বা দুই অঞ্জলি অধিক পান করে তবে টানাটানি পড়ে না—আর কেবল মাত্র কল হইতে যে জল বাহির হয় একটু খরচের বাড়াবাড়ি পড়িলেই ঠিক আবশ্যকের সময় সে তিরোহিত হইয়া যায়। যে সময়ে তৃষা প্রবল, রৌদ্র প্রখর, ধরণী শুষ্ক, যে সময়ে শীতল জলের আবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই সময়েই সে নলের মধ্যে তাতিয়া উঠে, কলের মধ্যে ফুরাইয়া যায়।

বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজ টুকুও অনুষ্ঠিত হইতে

পারিত না। একটি পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে তাহার জন্য চরাচরব্যাপী ভারাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক—একটি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিবে কিন্তু পৃথিবীবেষ্টনকারী বাতাস চাই। তেমনি সংসারের ক্ষুদ্র কাজ চালাইতে হইবে এই জন্য অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-নীতির আবশ্যক।

সমাজ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাস্থল ধ্রুব হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবগণ চলিয়া বেড়াই কিন্তু আমাদের পায়ের নীচেকার জমিও যদি চলিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে বিষম গোলযোগ বাধিত। বুদ্ধিবিচারগত আদর্শের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, মাটির উপর পা রাখিয়া বল পাই না, কোন কাজই সতেজে করিতে পারি না। সমাজের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করি কিন্তু জমির উপরে ভরসা না থাকাতে পাকা গাঁথুনী করিতে ইচ্ছা যায় না—সুতরাং ঝড় বহিলে তাহা সবসুদ্ধ ভাঙ্গিয়া আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে।

সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন, তাঁহারা অনেকে আপনাদিগকে বিজ্ঞ Practical বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এমন প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা মন্দ, কিন্তু Political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ নাই। সত্যঘটনা বিকৃত করিয়া বলা উচিত নহে, কিন্তু তাহা করিলে যদি কোন ইংরাজ অপদস্থ হয় তবে তাহাতে দোষ নাই। কপটতাচরণ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, কিন্তু দেশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃহৎ উদ্দেশ্যে কপটতাচরণ অন্যায় নহে। কিন্তু বৃহৎ কাহাকে বল! উদ্দেশ্য যতই

বৃহৎ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্য ধ্বংশ হইয়া যায় যে! হইতেও পারে, সমস্ত জাতিকে মিথ্যাচরণ করিতে শিখাইলে আজিকার মত একটা সুবিধার সুযোগ হইল—কিন্তু তাহাকে যদি দৃঢ় সত্যানুরাগ শিখাইতে তাহা হইলে সে যে চির দিনের মত মানুষ হইতে পারিত। সে যে নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহার হৃদয়ে যে অসীম বল জন্মাইত। তাহা ছাড়া, সংসারের কার্য্য আমাদের অধীন নহে। আমরা যদি কেবলমাত্র একটি সূচি অনুসন্ধান করিবার জন্য দীপ জ্বালাই সে সমস্ত ঘর আলো করিবে, তেমনি আমরা যদি একটি সূচি গোপন করিবার জন্য আলো নিবাইয়া দিই, তবে তাহাতে সমস্ত ঘর অন্ধকার হইবে। তেমনি আমরা যদি সমস্ত জাতিকে কোন উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে আমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৃহত্ত্ব একটিমাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্য্যকিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই উপরে তাহার সহস্র প্রকারের প্রভাব কার্য্য করে; তোমার যদি এক সময়ে খেয়াল হয় যে পৃথিবীতে সবুজ বর্ণের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, অতএব সেটা নিবারণ করা আবশ্যক ও এই পরম লোকহিতকর উদ্দেশে যদি একটা আকাশ-জোড়া ছাতা তুলিয়া ধর তবে সবুজ রং তিরোহিত হইতেও পারে কিন্তু সেই সঙ্গে লাল রং নীল রং সমুদয় রং মারা যাইবে, পৃথিবীর

উত্তাপ যাইবে আলোক যাইবে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই মিলিয়া মরিয়া পড়িবে। তেমনি কেবল মাত্র Political উদ্দেশ্যেই সত্য বদ্ধ নহে। তাহার প্রভাব মনুষ্যসমাজের অস্থি মজ্জার মধ্যে সহস্র আকারে কার্য্য করিতেছে—একটি মাত্র উদ্দেশ্যবিশেষের উপযোগী করিয়া যদি তাহার পরিবর্ত্তন কর, তবে সে আর আর শত সহস্র উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া উঠিবে। যেখানে যত সমাজের ধ্বংশ হইয়াছে এই রূপ করিয়াই হইয়াছে। যখনই মতিভ্রমবশতঃ একটি সঙ্কীর্ণ হিত সমাজের চক্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনন্ত হিতকে সে তাহার নিকটে বলিদান দিয়াছে, তখনই সেই সমাজের মধ্যে শনি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটি বস্তা সর্ষপের সদ্গতি করিতে গিয়া ভরা নৌকা ডুবাইলে বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হয় উপরিউক্ত সমাজের সেইরূপ উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব স্বজাতির যথার্থ উন্নতি যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে কল কৌশল ধূর্ত্ততা চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মত মানুষের মত মহত্বের সরল রাজপথে চলিতে হইবে, তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে যদি বিলম্ব হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি সুরঙ্গ পথে অতি সত্বরে রসাতলরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য।

পাপের পথে ধ্বংশের পথে যে বড় বড় দেউড়ী আছে সেখানে সমাজের প্রহরীরা বসিয়া থাকে, সুতরাং সে দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে বিস্তর বাধা পাইতে হয়; কিন্তু ছোট খিড়কীর দুয়ারগুলিই ভয়ানক সে দিকে তেমন কড়াক্কড় পাহারা নাই। অতএব, বাহির হইতে দেখিতে যেমনই হউক, ধ্বংশের সেই পথগুলিই প্রশস্ত।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। যখনি আমি মনে করি "লোক হিতার্থে যদি একটা মিথ্যা কথা বলি তাহাতে তেমন দোষ নাই" তখনই আমার মনে যে বিশ্বাস ছিল "সত্য ভাল," সে বিশ্বাস সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, তখন মনে হয় "সত্য ভাল কেন না সত্য আবশ্যক।" সুতরাং যখনই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কল্পনা করিলাম লোকহিতের জন্য সত্য আবশ্যক নহে, তখন স্থির হয় মিথ্যাই ভাল। সময় বিশেষে সত্য মন্দ মিথ্যা ভাল এমন যদি আমার মনে হয় তবে সময়-বিশেষেই বা তাহাকে বদ্ধ রাখি কেন? লোকহিতের জন্য যদি মিথ্যা বলি, ত আত্মহিতের জন্যই বা মিথ্যা না বলি কেন?

উত্তর। আত্মহিত অপেক্ষা লোকহিত ভাল।

প্রশ্ন। কেন ভাল? সময়বিশেষে সত্যই যদি ভাল না হয়, তবে লোকহিতই যে ভাল এ কথা কে বলিল?

উত্তর—লোকহিত আবশ্যক বলিয়া ভাল।

প্রশ্ন—কাহার পক্ষে আবশ্যক?

উত্তর—আত্মহিতের পক্ষেই আবশ্যক।

উত্তর—কই, তাহা ত সকল সময়ে দেখা যায় না। এমন ত দেখিয়াছি পরের অহিত করিয়া আপনার হিত হইয়াছে।

উত্তর—তাহাকে যথার্থ হিত বলে না।

প্রশ্ন—তবে কাহাকে বলে।

উত্তর—স্থায়ী সুখকে বলে।

তদুত্তর—আচ্ছা, সে কথা আমি বুঝিব। আমার সুখ আমার কাছে। ভাল মন্দ বলিয়া চরম কিছুই নাই। আবশ্যক অনাবশ্যক

লইয়া কথা হইতেছে; আপাততঃ অস্থায়ী সুখই আমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা ছাড়া পরের অহিত করিয়া আমি যে সুখ কিনিয়াছি তাহাই যে স্থায়ী নহে তাহার প্রমাণ কি? প্রবঞ্চনা করিয়া যে টাকা পাইলাম তাহা যদি আমরণ ভোগ করিতে পাই, তাহা হইলেই আমার সুখ স্থায়ী হইল।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইখানেই যে তর্ক শেষ হয়, তাহা নয়, এই তর্কের সোপান বাহিয়া উত্তরোত্তর গভীর হইতে গভীরতর গহ্বরে নামিতে পারা যায়—কোথাও আর তল পাওয়া যায় না, অন্ধকার ক্রমশঃই ঘনাইতে থাকে; তরণীর আশ্রয়কে হেয়জ্ঞানপূর্ব্বক প্রবল গর্ব্বে আপনাকেই আপনার আশ্রয় জ্ঞান করিয়া অগাধ জলে ডুবিতে সুরু করিলে যে দশা হয় আত্মার সেই দশা উপস্থিত হয়।

আর, লোকহিত তুমিই বা কি জান, আমিই বা কি জানি! লোকের শেষ কোথায়! লোক বলিতে বর্ত্তমানের বিপুল লোক ও ভবিষ্যতের অগণ্য লোক বুঝায়। এত লোকের হিত কখনই মিথ্যার দ্বারা হইতে পারে না। কারণ, মিথ্যা সীমাবদ্ধ, এত লোককে আশ্রয় সে কখনই দিতে পারে না। বরং, মিথ্যা একজনের কাজে ও কিছুক্ষণের কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু সকলের কাজে ও সকল সময়ের কাজে লাগিতে পারে না। লোকহিতের কথা যদি উঠে ত আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সত্যের দ্বারাই লোকহিত হয়, কারণ লোক যেমন অগণ্য সত্য তেমনি অসীম।

যেখানে দুর্ব্বলতা সেইখানেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কপটতা, অথবা যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা সেই খানেই দুর্ব্বলতা। তাহার

কারণ, মানুষের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য একটি নিয়ম আছে, মানুষ নিজের লাভ ক্ষতি সুবিধা গনণা করিয়া চলিলে যথেষ্ট বল পায় না। এমন কি, ক্ষতি, অসুবিধা, মৃত্যুর সম্ভাবনাতে তাহার বল বাড়াইতেও পারে। Practical লোকে যে সকল ভাবকে নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, কার্য্যের ব্যাঘাত-জনক জ্ঞান করেন, সেই ভাব নহিলে তাহার কাজ ভালরূপ চলেই না। সেই ভাবের সঙ্গে বুদ্ধি বিচার-তর্কের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। বুদ্ধিবিচার তর্ক আসিলেই সেই ভাবের বল চলিয়া যায়। এই ভাবের বলে লোকে যুদ্ধে জয়ী হয়, সাহিত্যে অমর হয়, শিল্পে সুনিপুণ হয়—সমস্ত জাতি ভাবের বলে উন্নতির দুর্গম শিখরে উঠিতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে, বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে। এই ভাবের প্রবাহ যখন বন্যার মত সরল পথে অগ্রসর হয় তখন ইহার অপ্রতিহত গতি। আর যখন ইহা বক্রবুদ্ধির কাটা নালা-নর্দ্দামার মধ্যে শত ভাগে বিভক্ত হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে তখন ইহা উত্তরোত্তর পঙ্কের মধ্যে শোষিত হইয়া দুর্গন্ধ বাষ্পের সৃষ্টি করিতে থাকে। ভাবের এত বল কেন? কারণ, ভাব অত্যন্ত বৃহৎ। বুদ্ধি বিবেচনার ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে। লাভ ক্ষতির মধ্যে তাহার পরিধির শেষ নহে—বস্তুর মধ্যে সে রুদ্ধ নহে। তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের অসীমতা। সম্মুখে যখন মৃত্যু আসে তখনও সে অটল, কারণ ক্ষুদ্র জীবনের অপেক্ষা ভাব বৃহৎ। সম্মুখে যখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত তখনও সে বিমুখ হয় না, কারণ লাভের অপেক্ষাও ভাব বৃহৎ। স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাবের নিকট ক্ষুদ্র হইয়া যায়।

আমাদের জাতি নূতন হাঁটিতে শিখিতেছে, এ সময়ে বৃদ্ধ জাতির